নির্ম্মলা।

(সামাজিক উপন্যাস।)

শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩/৪ নং গৌরমোহন মুখার্জীর ষ্ট্রীট্ মেট্কাফ্ প্রেস হইতে

মেসার্স মুখার্জ্জি এণ্ড চাটার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০৯।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

Printed by Messrs. Mukerjee & Chatterjee at the
METCALFE PRESS,
5 1, Gour Mohan Mukerjee's Street, Calcutta.

and

Published by the Author,
Magura Jessore.

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

নিয়তির সহিত সংগ্রাম করা মানবের সাধ্য নহে। নিয়তিতে যাহার যেরূপ আছে, তাহাকে তাহা অবশ্যই করিতে হইবে।

"অন্ধজনে দয়া কর দাতা মহাশয়"

এই বলিয়া প্রতি দ্বারে যাইবার নির্ম্মলা অন্ধের হস্তের যষ্টি হইল। অন্ধের মাংসপিণ্ড ও দুশ্চিন্তার গুরু ভার, এই যষ্টি বহন করিতে পারিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

মাগুরা।
সন ১৩০৬, ৪ঠা শ্রাবণ।

নিঃ শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

ভগবানের কৃপায় ও বঙ্গীয় পাঠকগণের সহৃদয়তায় সার্দ্ধ দ্বিমাসের মধ্যে সহস্র খণ্ড "নির্ম্মলা" পুস্তক বিক্রীত হওয়ায়, এবারে ইহা পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এবারেও মুদ্রাঙ্কণ ভ্রম সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল না। আশা করি, আমার অবস্থা বিবেচনায় সহৃদয় পাঠক । ক্ষমা করিবেন ইতি।

মাগুরা।
সন ১৩০৭, ৫ই জ্যৈষ্ঠ

নিঃ শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায়, অনেকের অনেক বাধা দেওয়া বিঘ্ন করা সত্ত্বেও এবারেও সহস্র খণ্ড পুস্তক তিন মাস মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া বিক্রীত হইয়াছে। এবারেও পুস্তকের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিলাম। পুস্তক সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য করা, এখন দেখিতেছি আমার ন্যায় হতভাগ্য অন্ধের পক্ষে অসাধ্য। সংপ্রতি বাজারে আমার নির্ম্মলার বিক্রয় দেখিয়া চারিখানি নির্ম্মলা বাহির হইয়াছে। যে সকল পাঠকগণ দয়া করিয়া আমার নির্ম্মলা ক্রয় করিতে অভিলাষী হয়েন, তাঁহারা পুস্তক বিক্রেতাগণের নিকট আমার নাম করিয়া নির্ম্মলা চাহিবেন নিবেদন ইতি।

মাগুরা।
সন ১৩০৮, ৬ই জ্যৈষ্ঠ। } নিঃ শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন।

অনেক বন্ধুর অনুরোধ ছিল, এবারে যেন নির্ম্মলার কলেবর কিছু পুষ্ট হয়। নানা কারণে বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। এবারে নির্ম্মলা ভ্রমশূন্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। অধ্যাপক শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংশোধন কার্য্যের ভার গ্রহণ করায় আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম নিবেদন ইতি।

মাগুরা।
১৩০৯.৫ আষাঢ়। } নিঃ শ্রী.যদুনাথ শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

আমার অগ্রজ ভ্রাতা শ্রীযুত কেদারেশ্বর তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য-প্রণীত ও মৎপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতার যাবতীয় পুস্তকালয়ে ও জেলা যশোহরের অন্তর্গত মহকুমা ও পোষ্ট মাগুরায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য। আমার নিকট হইতে পুস্তক লইলে ডাকমাশুল, প্যাকিং চার্জ ও ভ্যালুপেয়েবলে পুস্তক লইলে ভিঃ পিঃ খরচা লাগিবে না।

নিঃ শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য।

পুস্তকের নাম।	মূল্য।
কৃষ্ণচরিত	১।০
লক্ষ্মণচরিত	৷৵০
সরলা সুশীলা	॥০
আকবরের সিংহাসনাধিরোহণ বা কমলা	১॥০
বাঙ্গালা ছাত্রবন্ধু ব্যাকরণ (পদ্য-গদ্যময়)	।০
রচনা-প্রণালী	।৵০

নির্ম্মলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুশ্চিন্তা।

"মা-মা-মা!" দশনবর্ষীয়া কন্যা মাতাকে এইরূপে ডাকিল। "কি গা, এই যে, ডাকিস্ কেন?" জননী গৃহমধ্য হইতে এই উত্তর দিলেন। জননীর কণ্ঠস্বরে বোধ হইল, রোদন করিতেছেন। কন্যা মাতার রোদন স্বর শুনিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিল। কন্যা দেখিল, সত্য সত্যই মাতার চক্ষে জল। মাতা কন্যাকে দেখিয়া চক্ষের জল মুছিলেন। মাতা ও কন্যা উভয়েই নীরবে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

অদ্য সন ১২৭২ সালের শারদীয়া নবমী। সময় অপরাহ্ণ। চারিদিকে পূজার বাদ্য বাজিয়া বাজিয়া এক্ষণে একটু নিস্তব্ধ হইয়াছে, যেন সান্ধ্য উৎসবে ঘোর আড়ম্বর করিবার জন্য ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতেছে। নব বসন-ভূষণ-ধারী পূজা-দর্শকের একদল গৃহাভিমুখী হইতেছে. অপর দল প্রতিমা দর্শন মানসে বহির্গত হইতেছে। নিমন্ত্রণ-প্রিয় দ্বিজগণ স্ব স্ব সন্তানগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শিশুসন্তানগণের কাহাকেও স্কন্ধে, কাহাকেও কক্ষে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ গমন করিতেছেন। শারদীয় উৎসবের আগমনেই যেন দিক সকল পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন. আকাশ নির্ম্মল. ধরণী শুষ্ক, উদ্ভিজ্জচয় সতেজ, পশু দল প্রফুল্ল ও পক্ষিকুল পুলক-পূর্ণ। শারদীয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পক্ষিকুল সঙ্গীত ব্যাকুলতায় পূজার উৎসব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতেছে; বকুল ও শেফালিকা পরস্পর ফুল ছড়াছড়ি করিয়া, স্থলপদ্ম ও জলপদ্ম স্ব স্ব কুসুমধনের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়া. রজনীগন্ধ গন্ধ ছড়াইয়া. জবা, বক প্রভৃতি ফুলেরা রূপ বিকাশ করিয়া শারদীয় উৎসব রক্ষা করিতেছে; কুলবধূ ও কুলকন্যা সাজিয়া এবং গণিকাবৃন্দ পরকে রূপ দেখাইয়া এই মহোৎসবের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন; জ্ঞানী, গুণী. শিল্পী সকলে এ উৎসবে স্ব স্ব গুণের উৎসাহ পাইয়া নব বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া মহোৎসব প্রকাশ করিতেছেন। যে প্রসূতি ও কন্যার কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের বাসভূমি বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত জাড়গ্রাম, এই গ্রাম সুবিখ্যাত মৃত জমীদার বাবু সারদা প্রসাদ রায় মহাশয়ের বাসগ্রাম. চকদীঘি হইতে অধিক দূর নহে। এই গ্রাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন মেমারী হইতে তের মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও গ্রামে কতিপয় সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস আছে। গ্রামে বহুসংখ্যক বৃক্ষ,

লতা, বন, উপবন আছে। গ্রামখানির দৃশ্য দূর হইতে অতি মনোহর।

যে প্রসূতি ও কন্যার কথা কথিত হইয়াছে, তাহারা কৈবর্ত্ত জাতীয়া, জননীর নাম মহামায়া। মহামায়ার বয়ঃক্রম অষ্টাবিংশতি বৎসর। মহামায়ার চারিটি সন্তান—তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা। সন্তানগুলির মধ্যে কন্যাটী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা, নাম নির্ম্মলা, বয়ঃক্রম দশ বৎসর। মহামায়ার প্রথম পুত্রের নাম মধু, দ্বিতীয়ের নাম মাধব ও তৃতীয়ের নাম কেশব এবং বয়ঃক্রম যথাক্রমে আট, পাঁচ, দুই বৎসর। নির্ম্মলা বয়োজ্যেষ্ঠা হইলেও মধু অপেক্ষা তাহাকে ছোট দেখাইত। মহামায়া রূপবতী ছিলেন। তাঁহার বয়স অষ্টাবিংশতি বর্ষ হইলেও তাহাকে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষীয়া যুবতীর ন্যায় দেখাইত। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায় ছিল; তাঁহার অঙ্গযষ্টি নাতিদীর্ঘ, নাতি ক্ষুদ্র, নাতি-স্থূল, নাতি-কৃশ ছিল; তাঁহার দন্ত, ওষ্ঠ, নাসিকা, চক্ষু, ভ্রূ, ললাট, কেশ, চিবুক, হস্তপদ, করাঙ্গুলি, পদাঙ্গুলি, বক্ষ, কটি, নিতম্ব প্রভৃতি সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অনিন্দনীয় ছিল, সর্ব্বাপেক্ষা মহামায়ার প্রশংসনীয় ছিল—মন ও চরিত্র। তাঁহার মন অতিশয় সরল ও অমায়িক ছিল। রমণীকুলের উজ্জ্বল-কণ্ঠভূষণ লজ্জা ও তাহার মধ্যমণি পতিভক্তি। মহামায়ার লজ্জারূপ উজ্জ্বল হারে পতিভক্তি রূপ উজ্জ্বল রত্ন উত্তম শোভা পাইত। মহামায়ার স্বামী রামধন দত্ত মুর্শিদাবাদের একটি মোক্তারের ভৃত্য ছিলেন। যে বৎসরের কথা কথিত হইতেছে, সেই বৎসর রামধনের মোক্তার প্রভুর মৃত্যু হওয়ায়, তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর নায়েব দীননাথ বসু মহাশয়ের ভৃত্য হইয়াছিলেন।

রামধন বৎসরে দুই তিনবার বাটী আসিতেন। অন্য সময়ে বাটী আসিবার কাল ঠিক ছিল না, কিন্তু দুর্গাপূজার সময়ে বাটী আসিবার

কাল ঠিক ছিল। রামধনের স্বভাব বড় ভাল ছিল না। তাঁহার মোক্তার প্রভু নানা প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিতেন। রামধনও না বুঝিয়া কুসংসর্গে পড়িয়া নানাবিধ মাদক দ্রব্যে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মহামায়ার পতির দোষ গুণের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার পিতৃকুলে কেহ ছিল না। তিনি জানিতেন, পতি দেবতা তিনি প্রাণপণে পতির সেবা ভক্তি করিতেন।

রামধনের বাটীখানি বড় ছিল। তাহাতে আম, কাঁটাল, নারিকেল, লিচু, কুল, পেয়ারা, দাড়িম্ব প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় ফলের বৃক্ষ ছিল। মহামায়ার যত্নে রামধনের বাটীতে বার মাসের বারতরকারী উৎপন্ন হইত এবং সকল ঋতুর সকল ফুল ফুটিত। বাটীর একপার্শ্বে সুগভীর গর্ত্ত ছিল, মহামায়ার যত্নে তাহাতে নানাবিধ মৎস্য অনেক সময়ে সন্তরণ করিত।

মহামায়া অনশনে থাকিয়া ও গহনা বন্ধক দিয়া সংস্কারোপযোগী রামধনের গৃহগুলির যথাসময়ে সংস্কার করিতেন, গৃহ হইতে একটী খড় উড়িতে বা পড়িতে দিতেন না। তিনি গৃহগুলির দেওয়ালের মৃত্তিকায় এক রতি মাটি ফাটিতে বা পড়িতে দিতেন না। তিনি দেওয়ালগুলি মাজিয়া-ঘসিয়া, লেপিয়া-পুছিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতেন। তিনি ফল পুষ্পের বৃক্ষতল হইতে পতিত পত্র পর্য্যন্ত ঝাঁট দিয়া পরিষ্কৃত রাখিতেন। তিনি বাটীর যেখানে ঘাস রাখিলে ভাল হয়, সেখানে ঘাস রাখিতেন এবং যে স্থল পরিষ্কৃত রাখিলে ভাল হয়, সেই স্থান পরিষ্কৃত রাখিতেন।

প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময়, মহামায়ার এক মহোৎসবের দিন। রামধন বাটী আসিবে বলিয়া, মহামায়া আড়ম্বর উৎসবের একশেষ করি-

তেন। তাঁহার পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন গৃহদ্বার অধিকতর পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করিতেন। নানাপ্রকার কলাই কিনিয়া ডাল করিতেন, বড়ি দিতেন, তাঁহার সাংবৎসরিক পাকান, শুকান, পচান ফল-তরকারি, আমসত্ব, আচার পুনরায় সূর্য্যালোকে শোভা পাইত, তাঁহার শুষ্ক কাঁটালের বিচি আবার রৌদ্রে আসিত, তাহার কচি আমের আম্‌সী, বড় আমের আমসী, কাঁচা-মিঠা আমের আমসী, মিষ্ট-আমসত্ব, টক আমসত্ব আবার সূর্য্যমুখ দেখিত। তাহার কুলের আচার, তাঁহার চাল্‌তার আচার, তাঁহার আম কাসন, তেতুল- কাসন আবার সূর্য্য করে গন্ধ বিস্তার করিত। মহামায়া মুড়ি ভাজিতেন, মুড়াকি করিতেন। তিনি তিলের-নাড়ু করিতেন, নারিকেলের সন্দেশ বান্ধিতেন। তিনি দীপ-শলিতা পাকাইতেন। তাঁহার নিজকৃত পুরাতন ঘৃত আবার দ্রব্যবিশেষ দ্বারা সংস্কৃত করিয়া নূতন করিতেন। তিনি স্বামীর তামাক খাইবার টিকা, ঘুটা, ঘসিগুলা পর্য্যন্ত আবার শুকাইতেন।

মহামায়া আধুনিক শিক্ষিতা রমণী ছিলেন না। তিনি প্রাচীন পদ্ধতিক্রমে পতিভক্তি ও পতিসেবা জানিতেন এবং তাহার সেইরূপ আয়োজন ছিল। নবীনা শিক্ষিতা পাঠিকা মহামায়ার এইরূপ আয়োজন দেখিয়া বলিবেন, "অন্ধ গ্রন্থকার উপন্যাসে সন্নিবেশিত হইবার অযোগ্য বিষয় বর্ণনে গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন"—তাহার নিকট করজোড়ে বিনীত নিবেদন এই যে, যে মুখে সুমিষ্ট রসের মণ্ডামিঠাই রসনার লালসা পরিতৃপ্ত করে, সেই মুখে কখন কখন কটু তিক্ত রসের পলতা নিম্বও সেব্য হইয়া থাকে। যে নবীনা পাঠিকা, দেবী-চৌধুরাণীর বজরার ঠাট, দরবারের শোভা, ব্রজেশ্বরের গৃহের বিলাস সামগ্রী দেখিয়া নিরন্তর প্রফুল্লচিত্ত হন, তিনি নয়

একবার দীনা মহামায়ার দীন আড়ম্বরে প্রফুল্লতা হইতে বিরাম লাভ করিবেন।

এখন বলি, মহামায়া কাঁদিলেন কেন? শারদীয়া নবমীর সন্ধ্যা উপস্থিত। রামধন বাটী আসিলেন না, পুত্র কন্যাগণের নূতন বস্ত্র হইল না, মহামায়ার মহাআয়োজন ব্যর্থ হইল। সর্ব্বোপরি, রামধনের কি হইয়াছে? এই চিন্তায় কি মহামায়াকে কাঁদাইবে না? শারদীয়া মহা-নবমীর সন্ধ্যা আসিল, ক্রমে চন্দ্রভূষণা যামিনী সুন্দরীও আগতা হইলেন। ক্রমে মহামায়ার পুত্রকন্যাগণ আহার করিয়া শয়ন করিল। একে একে সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল—কেবল একা মহামায়ার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। অদ্য যে গৃহে পূজা হইতেছে, সেই ভবনের হাস্য পরিহাস-নিমগ্না, গীত-নৃত্য-দর্শন-শ্রবণে পরিতৃপ্তা, পতি আগমনে হৃষ্টা এক রমণীর সহিত নিদ্রাশূন্যা চিন্তাকুলা মহামায়ার অবস্থা তুলনা করিয়া দেখুন! লীলাময় ঈশ্বরের বিচিত্র লীলাপূর্ণ বিশ্বরাজ্যের অচিন্তনীয় রহস্য ভেদ করা মানব-বুদ্ধির অতীত। তাঁহার বিশ্ব সুখ দুঃখের বিচিত্র ভাণ্ডার। তিনি যুগপৎ সুখ দুঃখের রোল উঠাইতেছেন। তিনি এই ক্ষুদ্র ধরিত্রীর একদিক রজনী-তিমির-বাসে ঢাকিতেছেন, অপরদিক দিবাকরালোকে উদ্ভাসিত করিতেছেন। তিনি এক সরসীর একদিকে কমল কাঁদাইতেছেন, অপরদিকে কুমুদ হাসাইতেছেন। তিনি এক পল্লীর এক গৃহে পুত্রশোকের ক্রন্দন উঠাইতেছেন, অপর গৃহে নবজাত কুমারের জন্মোৎসবে পূর্ণ করিতেছেন। তিনি একসঙ্গে ভ্রমণশীল দুই পান্থের একদৃশ্যে মন আকৃষ্ট করিয়া একজনকে দুঃখের বিষে জর্জ্জরিত করিয়া ও অপরকে সুখের সাগরে ভাসাইয়া রঙ্গ করিতেছেন। লীলাময়, রাজবিভব সন্ন্যাসীকে দিতেছেন, রাজাকে

ভিক্ষার পথে আনিতেছেন, শ্মশানকে নগর করিতেছেন, নগরকে শ্মশান করিতেছেন।

মহামায়া রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত দূরস্থ জনগমনের পদশব্দে, বায়ু-হিল্লোলে, বৃক্ষ-পতিত শুষ্ক পত্রের শর্ শর্ শব্দে, ভেকলম্ফনে মূষিক গমনের সামান্য শব্দে ভাবিতে লাগিলেন, রামধনেরই পদশব্দ হইতেছে। শব্দের ন্যূনাধিক্য অনুসারে কোনবার উঠিয়া বসিতে লাগিলেন; কোন-বার বা দীপ জ্বালিতে লাগিলেন। আশা ও চিন্তা নিদ্রাশূন্যা অবলার সহিত নানা কৌতুকই করিতে লাগিল। আশা কোন মুহূর্ত্তে সুস্থকায়, সবল শরীর রামধনকে বাটী আনিতে লাগিল, তাহার সহিত কত বস্ত্র, কত অর্থ কত মিষ্টান্ন দেখাইতে লাগিল। চিন্তা কখন রামধনের ভয়ানক পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহামায়ার ঘোর বিড়ম্বনা ইত্যাদি শোচনীয় দৃশ্য দেখাইয়া অবলাকে কাঁদাইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর মহামায়ার নিদ্রা হইল না। কখন আশার খেলায় একটু আশ্বস্ত হইতে লাগিলেন, কখন নিষ্ঠুরহৃদয়া চিন্তার পীড়নে কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইতে লাগিলেন। রে দুশ্চিন্তে! তুই নরনারী কাঁদাইবার কে? তুই বঙ্গের প্রতিঘরে ভ্রমণ পূর্ব্বক হাস্যপ্রফুল্লিত মুখ সকলে বিষাদের কালিমা মাখিয়া দিতেছিস কেন? তোর এ অব্যাহত গতি, এ অতুলনীয় আধিপত্য কে দান করিল? তুই নর নারীর হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া তাহাদিগের সুশীতল মস্তিষ্ককে উষ্ণ করিবার শক্তি কোথায় পাইলি? সম্পদ বিভবে কাহার না গর্ব্বের উদয় হয়? তুই আমার কথার উত্তর দিবি না? তুই মানবের কর্ম্ম দোষের অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা-দের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছিস। যদিও বৈরাগ্যের সুদৃঢ় পরিখা হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়াছে, তথাপি তাহারা স্বার্থের সুস্নিগ্ধ সুন্দর

রত্ন হৃদয়-মন্দিরে সংস্থাপন করিয়াছে। পার্থিব অনিত্য সুখকে হৃদয়-মন্দিরের নৃপাসন দিয়াছে। সেই নিত্য সুখময় হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ রাজচক্রবর্ত্তীর রাজচক্রবর্ত্তী অমিততেজা ভগবানকে হৃদয়সিংহাসন হইতে চ্যুত করিয়াছে। অনিত্য পার্থিব সুখের প্রহরিণী হইয়া কেন না নরহৃদয়ে প্রবেশ করিবি? সেই নূতন নরপতির অকল্যাণ ভয়ে কেন না তুই নিয়ত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবি? পক্ষি-কূজনে শারদীয়া মহা-নবমীর নিশা প্রভাত হইবার সময়ে মহামায়া স্বপ্ন দেখিলেন—ক্ষুদ্র সরো-বরে কয়েকটী শাবক সহ একটী হংসী, হংসের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। অবিলম্বে এক ক্ষীণকায় হংস নিকটে আসিল। হংস অগাধ জলে ডুবিয়া গেল, হংসী সহস্র চেষ্টায় আর হংসকে সন্তরণ করাইতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবল ঝড় বহিল। ঝড় দুইটী শাবক উড়াইয়া লইয়া গেল, ছোট দুইটী হংসীর পক্ষের মধ্যে রক্ষা পাইল। ঝড় থামিল আবার আকাশে পরিষ্কৃত দিন হইল, আবার মৃদু বাতাস বহিল। মহামায়া আবার দেখিলেন, সেই হংসী সেই শাবক সকল লইয়া এক কমল-কুমুদ-শোভিত বৃহত্তর দিব্য সরোবরে সন্তরণ করিতেছে।

মহামায়া স্বপ্ন বুঝিলেন না। কি স্বপ্ন দেখিলেন, ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। হংসটা ডুবিল কেন, এক একবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবতার নাম স্মরণ করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মিলন।

শারদীয়া দশমীর উষায় রক্তিম দিবাকর পূর্ব্বগগনে উদিত হইলেন। চারিদিকে পূজার বাটীর বাদ্য-বিষাদ-গম্ভীরশব্দে বাজিয়া উঠিল। প্রভাত-বায়ু বিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। বৃক্ষ-লতা সে নিশ্বাসে শিশিরাশ্রু পরিত্যাগ করিল। পুষ্পবৃক্ষচয় কুসুমহার খুলিয়া ফেলিল। দূর্ব্বাদল শিশির-মুক্তামালা পরিত্যাগ করিল।

ক্রমে বেলা হইল, মহামায়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। তিনি এক একবার গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন, আর এক একবার স্বপ্ন চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক একবার সম্ভবতঃ রামধন যে পথ দিয়া বাটী আসিতে পারেন, সেই পথের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। নয়টা বাজিল। মহামায়া গৃহকার্য্য সারিয়া কেশবকে কোলে লইয়া রামধনের

আসিবার পথের দিকে দৃষ্টি করিয়া বারন্দার উপর বসিলেন। (লোকের আশা সফল হউক, প্রতিগৃহ আনন্দে পরিপূর্ণ হউক)।

মহামায়া দূরে একটি লোক দেখিলেন। তিনি আবার দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, লোকটী তাঁহার বাটীর দিকেই আসিতেছে। তিনি তৃতীয়-বার দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, লোকটী তাঁহার স্বামীর মত বটে, কিন্তু তদপেক্ষা ক্ষীণকায়। চতুর্থ বার দৃষ্টি করিয়া তিনি চিনিলেন, সত্য সত্যই তাঁহার স্বামী আসিতেছেন ; কিন্তু তাঁহার সে রূপ নাই, সে শরীর নাই। মহামায়া অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীকে আগুইয়া আনিলেন। চারি চক্ষুর মিলন হইল। মহামায়ার আয়ত লোচনে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

রামধন নিজগৃহের বারান্দার উপর আসিয়া উপবেশন করিলেন। পুত্র কন্যাগণ তাঁহাকে বেরিয়া বসিল। মহামায়া তামাক প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পুত্র কন্যাগণ একে একে নববস্ত্র ও মিষ্টান্ন লইয়া বিদায় হইল, রামধন বিশ্রাম করিয়া মহামায়ার নির্ব্বাক প্রশ্নরূপ অশ্রুধারার উত্তর করিতে বসিলেন। রামধন কহিলেন, "আমার বড় কঠিন পীড়া হইয়াছে। আমি নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় মোক্তার বাবুর পয়সায় নানা প্রকার নেশা করিতে অভ্যাস করিয়া এক্ষণে মারা পড়িলাম! এক্ষণে নিজের পয়সায় আর নেশা করা চলেনা। দুই এক পয়সার গাঁজা আফিং খাই বটে, তাহাতে আমার আর শরীর রক্ষা হয় না। প্রায় দেড় মাস হইল, বিষম উদরাময় রোগ হইয়াছে। নায়েব বাবু আমাকে কাশিম-বাজারের রাজ কবিরাজের চিকিৎসায় রাখিয়া বাটী আসিয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসায় পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, ঔষধ ছয় মাস ব্যবহার করিতে হইবে। কবিরাজ মহাশয়ই যত্ন করিয়া আমাকে কয়েক প্রকার ঔষধ দিয়া বাটী পাঠাইয়া-

ছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিদেশে ভাল যত্ন শুশ্রূষা হয় না। বাটীর যত্নে, শুশ্রূষায় ও কয়েক প্রকার ঔষধের ব্যবহারে পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে। আমার বিশ্বাস, তোমার যত্ন-শুশ্রূষায় পীডা সারিবে। এই পীড়ার কারণে আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছে।'' মহামায়া উত্তর করিলেন, "হরিঠাকুর আছেন, মা কালী আছেন। পেটের ব্যামো বইত নয়, দিন কয়েক সকাল সকাল চুনা মাছের ঝোল, ভাত আর ঔষধ খেলেই ব্যামো সারিয়া যাইবে। সে জন্য ভাবনা কি ?''

অদ্য পতিভক্তিপরায়ণা সতীর উল্লাসের সীমা নাই। তিনি এক একবার গৃহকার্য্য করিতেছেন, একবার স্বামীর ভাল আহারের আয়োজন করিতেছেন, স্নানের আয়োজন করিতেছেন। শয়নের আয়োজন করিতেছেন, তাম্বুল, তামাকু সেবনের আয়োজন করিতেছেন, আবার দৌড়াইয়া আসিয়া স্বামার নিকট বসিয়া বাটী হইতে গমনের দিন হইতে প্রত্যাগমনের দিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিনের সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনিতেছেন। স্বামীর সুখের কথায় মৃদু মধুর হাসি হাসিতেছেন, স্বামীর দুঃখের কথায় তাঁহার আয়ত-লোচনে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে।

পাঠক, আপনার কি প্রকৃত ভালবাসার লোক আছে? তাহার সহিত আপনার দীর্ঘকাল পরে কি দেখা হইয়াছে? যাহাদের পরস্পর প্রকৃত ভালবাসা আছে, তাহাদের দীর্ঘকাল পরে মিলন বড় অপূর্ব্ব মিলন। তাহাদের পরস্পরের কথার শেষ হয় না, পরস্পরের দর্শনেও পরিতৃপ্তি হয় না। তাহাদের সুখ দুঃখের কথাই মধু, চারি চক্ষুর মিলনই অমৃত উৎস, তাহাদের হৃদয়ে আনন্দ সাগর। সে সুখ বর্ণনীয় নহে,

চিত্র করিবার যোগ্য নহে, কল্পনায় দেখাইবার মত নহে, ভোগী ভোগ-স্মৃতি স্মরণ করিয়া দেখিতে পারেন। মিলনের দিন প্রণয়িযুগলের গৃহ আনন্দময়, সংসার আনন্দময়, শ্রম আনন্দময়, জগৎ আনন্দময়।

পাঠক পার্থিব মিলনে সুখ দেখিলে? নরের নরের সহিতে, নারীর নারীর সহিতে অথবা নরের সহিত নারীর সংযোগ হওয়ার নাম মিলন। আর নরাত্মার সহিত ঈশ্বরের মিলনের নাম যোগ। মিলন ইহ সংসারের স্বর্গ, যোগ নিত্য স্বর্গের দৃঢ় সোপান। মিলনে অনিত্য সুখ, যোগে নিত্য সুখ। চর্ম্ম, মাংস, অস্থি প্রভৃতি উপাদানভূত ধ্বংসশীল মানব বা মানব দর্শনে মানব যদি এত সুখী হও, তবে তোমার মরণধর্ম্মশীল দেহ ছাড়া যে অমর জ্যোতি আছে, তাহার সহিত সেই পরমানন্দ সচ্চিদানন্দ অচ্যুতের সহিত মিলনে কত সুখ ভাবিয়া দেখ। যিনি অনন্ত সুখের উৎস, যিনি সর্ব্বসুখের নিত্য আদি কারণ, সুখস্বপ্ন যাহার দৈনিক মায়া, সুখই যাহার মহাবিভূতি সেই অচ্যুতের দিকে কি একবার যোগবলে ধাবিত হইতে চাও? পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিয়া সুখী হও, স্ত্রী পুত্রের সহিত মিলিয়া আনন্দভোগ কর, বালক বালিকার সহিত মিলিয়া প্রীত হও, এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া সেই মহা মিলনের জন্য মন প্রস্তুত কর; মিলনের দিকে ধাবিত হও; অনিত্য মিলন হইতে নিত্য মিলনে আসক্ত হও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পীড়ার বৃদ্ধি।

পীড়া বা ব্যাধি কি? পীড়ার উৎপত্তি কেন হয়? এ দুই প্রশ্নের উত্তর কি সহজ? বোধ হয় প্রকৃতিতে উৎপন্ন মানব যদি প্রকৃতির গতিতেই ভাসমান হয়, তবে আর তাহাকে পীড়ার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইতে হয় না। স্বভাবে যাহা বলে, স্বভাবে যাহা চায়, মানব সেই স্বভাবাজ্ঞা-লঙ্ঘন করিয়া বিভিন্ন গতি সম্পন্ন হইলেই স্বভাব আবর্ত্ত পীড়ায় পড়িয়া হাবুডুবি খাইতে থাকে। পীড়া কি ভয়ঙ্কর। পীড়ায় লোকের কি না করিতে পারে? পীড়ায় কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, হৃদয় মন প্রভৃতি সকলই নষ্ট করিয়া থাকে। পীড়াবর্ত্তে হাবুডুবি খাইয়া ডুবিতে পারিলে ত লোকে রক্ষা পাইল, আর যদি ডুবিতে না পারে, ইন্দ্রিয়, হৃদয় ও মন

হারাইয়া বাঁচে, তবে তাহার মর্ত্ত্যধামেই নরক ভোগ সহ্য করিতে হয়। অতএব বলি, মানব ভীষণ বৈরী পীড়াকে ভয় করিও।

কিছুতেই বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কালপ্রবাহ অবিরাম-গতিতে নিরত প্রবাহিত হইতেছে। আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ অতীত হইল, পৌষের শেষ ভাগ আসিল। শরৎ, হেমন্ত স্ব স্ব বেশ বিলাসে আবির্ভূত ও তিরোভূত হইলেন। শীত ঋতু সদর্পে ধরিত্রী-পৃষ্ঠে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচরবৃন্দ ধরিত্রী-পৃষ্ঠে ছাইয়া পড়িল। উত্তর দিকস্থ প্রবল শীতল বায়ু প্রবাহিত হইল। কুজ্ঝটিকা দিঙ্মণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিল। রবিকর ক্ষীণতর হইল, তারকা শোভিত নিশাকর শোভাহীন হইলেন।

কালপ্রবাহে ভাসমান নরজীবন তৃণও যে যে নিয়তি আবর্ত্তে পতিত হইবার, তাহা হইবেই হইবে। নিয়তির গতিরোধ করে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। আমরা কাহাকেও অদৃষ্টবান্ বলিতেছি, কাহাকেও ভাগ্যহীন বলিতেছি, কাহাকেও বুদ্ধিমান্ বলিতেছি, কাহাকেও নির্ব্বোধ বলিতেছি, কাহাকেও সুচতুর কৌশলী বলিতেছি, কাহাকেও অকর্ম্মণ্য বলিতেছি; বাস্তবিক, এই সকল সুখ্যাতি বা অখ্যাতি মানবেরা নিয়তির ফলানুসারে লাভ করিতেছে। রাম কোটিপতি হইল, আর কোটীশ্বর শ্যাম রাজপথের ভিখারী হইল, ইহাও নিয়তি চক্রের ফল। মানব কিছুই করে না, মানবের কিছুই করিবার সাধ্য নাই, সে নিয়তির কলে চালিত হইয়া, নিয়তির ফলে কখনও অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিতেছে কখন বা পারিতেছে না। যদি পার্থিব যশ ও উন্নতি মানবের চেষ্টা-সাধ্য হইত, যদি পার্থিব আধি-ব্যাধি দূর করা মানবের যত্নসাপেক্ষ হইত, তাহা হইলে, এই পৃথিবীর সকল লোকের অবস্থা সমান হইত এবং

সর্ব্ব প্রকার আধি ব্যাধি পৃথিবী হইতে বিদূরিত হইত। এ সংসারে কাহার ইচ্ছা নয় যে, আমার উন্নতি হউক, আমি যশস্বী হই, আমার পরিবারস্থ সকলে ব্যাধিশূন্য বিড়ম্বনাশূন্য হউক? সকলে ইচ্ছা করিলে কি হইবে, সকলের ত নিয়তি সমান নহে। কেহ হয়ত বলিলেন, সকলের বুদ্ধি, চেষ্টা, যত্ন, সমান নহে; আমি বলি, সকলের নিয়তিই সমান নহে। সমবুদ্ধিমান দুই জনে সমান মূলধন লইয়া সমান স্থলে এক ব্যবসায় আরম্ভ করিল, এক জন সেই ব্যবসায়ে কোটিপতি এবং অপর জন সেই ব্যবসায়ে সর্ব্বস্বান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্য বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন দুই জন বি-এল, সমান পরিশ্রমী ও যত্নশীল হইলেও একজন আজীবন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনে শিক্ষক ও অপর ব্যক্তি হাইকোর্টের জজ। এ সকল দেখিয়া নিয়তি না মানিয়া থাকিতে পারি না। যাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায়, অবসর, সুবিধা, ক্ষেত্র, সময় ইত্যাদির কথা বলিবেন, তাঁহাদিগের কথায় পুনঃপুনঃ এক উত্তর দিয়াই বলিব, যাহাদের নিয়তি ভাল, তাঁহাদের ঐ সকল ভাল জোটে বা হয়।

এখন দেখা যাউক, রামধন কাল-প্রবাহে কোথায় আসিয়াছেন। তাঁহার নিয়তির আবর্ত্তপুঞ্জের কোন্ আবর্ত্তে তিনি ঘূর্ণিত হইতেছেন এবং মহামায়াই বা তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কিরূপ প্রয়াস পাইতেছেন? রামধনের বাটী হইতে যাওয়া হয় নাই। তাঁহার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কাশিমবাজারের রাজ-বৈদ্যের নিকট পত্রের পর পত্র লিখিয়া ঔষধের পর ঔষধ আনাইয়া সেবন করিলেন, পীড়ার কিছুমাত্র উপশম হইল না, মহামায়া বিশেষ চেষ্টা করিয়া নিজ গ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের যে লোকে যে ঔষধ জানিত, তাহা আনাইয়া সেবন করাইলেন। পাতা, লতা, ত্বক্, মূল অনেক সেবন করাইলেন। জলপড়া, তেলপড়া

প্রভৃতি ব্যবহার করাইলেন। মন্ত্রতন্ত্রও যথাসাধ্য প্রয়োগ করা হইল। নিয়তির গতি কে রোধ করে? রামধনের পীড়ার কিছুতেই উপশম হইল না।

মহামায়া গহনা বিক্রয় করিয়া, অর্থ ঋণ করিয়া খ্যাতনামা চিকিৎসক আনাইলেন, তাঁহাদের চেষ্টাও ফলবর্তী হইল না। মহামায়া দেবালয়ে ঘুরিলেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, মাথা কুটিলেন, কোথাও হইতে ধূলি, কোথাও হইতে চরণামৃত, কোথাও হইতে ফুল, কোথাও হইতে বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করাইলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। তিনি বিল্বমূলে মাথা কুটিলেন, তিনি তুলসীমূলে গড়াগড়ি দিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। তিনি হরি, কালী, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি কত দেবতার নিকট কত মানসা করিলেন, কত দেবতার নামে কত উপবাস করিলেন, কিছুতেই রামধনের পীড়ার সুলক্ষণ দেখা দিল না।

রামধনের পীড়া বাড়িল, শরীর দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইল, ক্রমে আহারের প্রবৃত্তির হ্রাস হওয়ায় অরুচি আসিয়া উপস্থিত হইল। মহামায়া রোগীর সেব্য নিজে যাহা প্রস্তুত করিতে জানিতেন, তৎসমুদয় প্রস্তুত ও পাক করিয়া দিলেন। গ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাচিকাগণ যাহা পাক করিতে পারিতেন, তাহাও সযত্নে, আগ্রহে পাক করাইয়া রামধনকে আনাইয়া দিলেন। ক্রমে যখন রামধনের আহার শক্তির একেবারে লোপ হইল, চিকিৎসকেরা যথেচ্ছ পান :ভোজন করিতে বলিলেন, তখনও মহামায়ার চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। যদিও রামধনের জন্য ডাব, ইক্ষু গাড়ি গাড়ি আসে নাই, ভারে ভারে মিশ্রি, সন্দেশ, ওলা, মিঠায়ের আমদানী হয় নাই, ঝুড়ি ঝুড়ি বেদানা, দাড়িম্ব, আপেল, আঙ্গুর, আতা, পেয়ারা সংগ্রহ করা হয় নাই, হাঁড়ি হাঁড়ি আম-

সত্ত্ব, আচার, মোরব্বা, চাটনির আড়ম্বর করা জোটে নাই, তথাপি মহামায়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ও প্রতিবেশিগণের হাতে পায়ে ধরিয়া, চক্ষের জলে পা ভিজাইয়া, রামধন যখন যে আহারীয় দ্রব্যের অভিলাষ করিয়াছেন ও মহামায়া যে কোন আহারীয় দ্রব্যের নাম জানিতেন, তৎসমুদয় রামধনের নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পৌষ মাসের দুই চারি দিন থাকিতে রামধনের সকল পীড়াই যেন উপশম হইল। তাঁহার আহারের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইল। তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার কথা কহিবার শক্তি যেন আসিল। মহামায়ার গুণে প্রতিবেশিগণ তাঁহার বড় বাধ্য ছিল। তাহারা প্রতি দিন দলে দলে রামধনকে দেখিতে আসিত। তাহারা এক্ষণে রামধনকে দেখিয়া মহামায়াকে আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিল, "শীত গেলে রামধনের পীড়া বিনা ঔষধেই আরোগ্য হইবে"। কিন্তু মন্দ লক্ষণের মধ্যে রামধনের হস্তে, পদে শোথ্ দেখা দিল এবং চিকিৎসকেরা কোন আশাপ্রদ কথা বলিলেন না। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপ একটু জ্বলিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্মশান।

অদ্য পৌষ মাসের সংক্রান্তি। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। অন্ধকারময়ী রজনীর অন্ধকার ঘনঘটায় অধিকতর গাঢ় হইয়াছে। উত্তর দিক হইতে প্রবল শীতল বায়ু বহিতেছে। শীতে অস্থি-মজ্জা পর্য্যন্ত কম্পিত করিতেছে। কখন কখন প্রবল বায়ুপ্রবাহের সহিত প্রবল বৃষ্টিধারা পতিত হইতেছে, আবার কখন বা অপেক্ষাকৃত মৃদু বায়ুপ্রবাহের সহিত অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। ধরিত্রী যেন স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া নিস্তব্ধ। ভীতা ধরণীকে অধিকতর ভীতা করিবার মানসে বায়ু উচ্ছৃঙ্খলভাবে বৃক্ষরূপ দণ্ড কাঁপাইয়া ব্রততীরূপ কুন্তল নাচাইয়া নৃত্য করিতেছে। সেই নৃত্য-শ্রমজনিত স্বেদবিন্দুসকলই যেন বৃষ্টি-

বারিবিন্দুরূপে পতিত হইয়া ধরণীতল সিক্ত করিতেছে। দুর্য্যোগের রাত্রিতেই দুর্ঘটনা ঘটে।

অদ্য প্রাতঃকালে রামধনের অতি বিষম জ্বর হইয়াছে, তাঁহার হস্ত পদের শোথ্ শুকাইয়াছে। আড়াই প্রহরের পর হইতে আর রামধনের সংজ্ঞা নাই। তাঁহার বুকে শ্লেষ্মা ভর করিয়াছে, তিনি কষ্টে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। সকলেই বুঝিয়াছে, রামধনের জীবনবায়ু বহির্গত হইতে আর বিলম্ব নাই। মহামায়ার মুখ শুকাইয়া গেল। মহামায়ার পুত্রকন্যাগণ যেন আপনা আপনি ভীত হইয়া উঠিল। অদ্য এই বৃষ্টি-বায়ুর মধ্যেও রামধনের বাটী লোকশূন্য হইতেছে না। মহামায়ার গুণে, মহামায়ার এই বিপদের দিনে, প্রকৃত বিপদবন্ধুর ন্যায় অনেকেই পুনঃ পুনঃ দেখা দিতেছিলেন। প্রতিবেশিগণের পরামর্শে ঠিক হইল, চারি জন কার্য্যকুশল প্রতিবেশী সমস্ত রাত্রি রামধনের বাটীতে থাকিবেন।

গৃহের মধ্যস্থলে রামধনের শয্যা প্রস্তুত হইল। এক পার্শ্বে মহামায়ার পুত্রকন্যাগণ শয়ন করিল ও অপর পার্শ্বে প্রতিবেশিগণের শয়নের স্থান হইল। মহামায়া একটি দীপ জ্বালিয়া রামধনের ম্লান মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর রামধন ইঙ্গিত দ্বারা মহামায়াকে বুঝাইলেন, তাঁহাকে শর্করার সহিত অহিফেন গুলিয়া সেবন করাইতে হইবে এবং তাঁহার নাকে মুখে গাঁজার ধূম দিতে হইবে। মহামায়া অবিলম্বে তাহা করিলেন। রামধন প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, একটু সবল হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"আর সময় নাই, আমি ইহলোক ছাড়িয়া চলিলাম। তোমাকে সন্তানগুলির সহিত অকূল পাথারে ভাসাইয়া চলিলাম। ধর্ম্ম

আমি জানিতাম না, দেবদেবী আমি মানিতাম না; ধর্ম্ম থাকিলে অকালে তোমাদিগকে কাঁদাইয়া ও নিজে কাঁদিয়া ইহলোক ছাড়িতে হইত না। ধর্ম্ম যাহা শিখিয়াছি, ধর্ম্মে যেটুকু বিশ্বাস হইয়াছে, সে তোমার কথায়। তুমি আমার স্ত্রী, তুমি আমার পরামর্শদাত্রী, তুমি আমার ধর্ম্মশিক্ষয়িত্রী। তোমার মত স্ত্রী সংসারে অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। আমি এই অন্তিমকালে কি ধন দিব, আমার দেয় কিছুই নাই। আমি তোমাকে এইমাত্র বলিয়া যাইতে পারি, তোমার হরিতেই যেন অচল বিশ্বাস থাকে। হরি তোমায় সকল বিপদে উদ্ধার করিবেন। তিনি তোমার পালন ও রক্ষাকর্ত্তা হইবেন। হরি, হরি, হরি।"

এই কথা বলিতে বলিতে রামধনের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মহামায়ার অশ্রুধারা শতধারে প্রবাহিত হইয়া গণ্ডদেশ প্লাবিত করিল। রজনীও প্রভাত হইয়া আসিল, বায়ুবৃষ্টি থামিল।

১২৭২ বারশত বাহাত্তর সালের ১লা মাঘের প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইল। বৃষ্টিস্নাত তরুবল্লী গাত্র ঝাড়িয়া রৌদ্রে শরীর তপ্ত করিবার জন্য দাড়াইল। বিপদশেষে জয়োল্লাসের ন্যায় বিহগকুল নব সূর্য্য দর্শনে স্ব স্ব রবে বন উপবন নিনাদিত করিতে লাগিল। বৃষ্টিবারি-নষ্টকুসুম-কলিকা, ম্লানভাবে ফুটিল, বৃষ্টি-ধৌত কুসুম কোরক সৌরকরে সৌন্দর্য্য-বিভব বিকাশ করিতে লাগিল।

বেলা প্রায় চারি দণ্ড হইল। সৌরকর খরতর হইয়া উঠিল। রামধনের শ্বাস দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইল। প্রতিবেশিনীগণে রামধনের গৃহ পরিপূর্ণ হইল। মহামায়ার অশ্রুধারা সহস্রধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার পুত্রকন্যাগণও রোদন করিতে লাগিল। হৃদয়বান

প্রতিবেশী নরনারীর মধ্যেও অনেকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। দুঃখ পূর্ণ বিষাদগম্ভীর হরির নামের উচ্চ রোলের সহিত রামধনের জীবনবায়ু বহির্গত হইল।

মহামায়া ছিন্নমূল লতিকার ন্যায় সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া ভূপতিতা হইলেন। তাঁহার সন্তানগণও ভূপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। হে দগ্ধ বিধাতঃ! অরে পাপাশয় যম! তোদের কেমন বিচার, কেমন ব্যবস্থা! তোদের দয়া মমতার লেশ নাই, তোদের অন্তরে সমবেদনার বিন্দুমাত্র নাই। যে ফলভারাবনতাঙ্গী সরলা লতিকা এক জীর্ণকায় তরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার মূলে কি প্রকারে কুঠারাঘাত করিলি? ফল লতিকা যে যায় যায়। ক্রন্দনের রোল, বিষাদের আর্ত্তনাদ উঠানই কি তোদের ব্যবসায়? সুখের সংসারে বিষের জ্বালা উদ্দীপ্ত করাই কি তোদের কার্য্য? যে সরলা লতিকার অবলম্বন নাই, আশ্রয় নাই, কুটিলতা নাই, পাপাচার নাই, বিলাসের চেষ্টা নাই, নিজ সুখের কামনা নাই, হৃদয়মন্দিরের একমাত্র উপাস্য দেবতা পতির সেবাই যাঁর একমাত্র করণীয় কর্ম্ম তাঁহার পতিহরণ করিয়া কেন তাঁহাকে মর্ম্মপীড়া দিলি? দয়াশীলা প্রতিবেশিনীগণের যত্নে মহামায়া সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি যুগপৎ পতির শব ও পতির কর্দ্দমলিপ্ত রোরুদ্যমান সন্তানগণের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি আসিল। তিনি ভাবিলেন, নিয়তিতে যাহা হইবার তাহা হইল। বিধাতৃ বিধানে কর্ম্মফল যাহা আছে, তাহা হইল। অদৃষ্টফল ভোগ করিব, তাহাতে কর্ত্তব্য-পথ ছাড়িব কেন? পতি ইহলোক ছাড়িলেন, তদীয় সন্তান প্রতিপালনই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে দয়া, মমতা হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল। তিনি সন্তানগণের দীন, শোকাচ্ছন্ন ভাব দেখিয়া কেশবকে কোলে লইলেন,

মাধবকে উঠাইয়া লইলেন, মধুকে বসিতে বলিলেন ও নির্ম্মলাকে রোদন সংবরণ করিতে কহিলেন।

অবিলম্বে অনতিদূরস্থ শ্মশানে মধুর সহিত প্রতিবেশিগণ রামধনের শব বহন করিয়া লইয়া গেল। চিতা শয্যায় রামধনের দেহ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শবদাহকেরা মধ্যে মধ্যে বিষাদগম্ভীর হরির নাম করিতে লাগিল। মানব, মানবজীবনের পরিণাম এই! তুমি আমি এখানে আসিব। রাজা, ভিক্ষুক, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই এখানে আসিবে। যে অঙ্গের বিলাস সাধনে তুমি এত ব্যাপৃত, যে অঙ্গের সহস্ররূপে সৌষ্ঠবকরণে তুমি সর্ব্বদা নিরত, তাহার পরিণাম এই চিতাভস্ম। দম্ভ, অভিমান, স্পর্দ্ধা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, কদাচার, মিথ্যালাপ প্রভৃতি সকলেরই পরিণাম এখানে! পরস্বাপহরণ, পরদারহরণ, পরনির্য্যাতন প্রভৃতির পরিণাম এখানে! শোক, তাপ, আমোদ, উচ্ছ্বাস প্রভৃতির পরিণাম এখানে! দুই দিনের জন্য এই ভব-পান্থশালায় আসিয়া চিতানল-পন্থায় অনন্তধামে যাইতে হইবে। এই ভবের বাজারে কোন্ পণ্য সঙ্গে লওয়া যাইতে পারে, ও কি এখানে রাখা যাইতে পারে, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। যে সকলের জন্যে তুমি বড় ব্যাকুল, যে সকলের জন্য তোমার অবিরাম যত্ন, তৎসমুদয়ের পরিণাম চিতাভস্ম ভবের বাজারে পুণ্যই সঙ্গে লইবার পণ্য। আর এ বাজারে সুকীর্ত্তিই রক্ষণীয় বস্তু। পণ্ডিতগণ বলেন, "কীর্ত্তির লয় ক্ষয় আছে, মহাপ্রলয়ে ধ্বংস আছে; পুণ্যের লয় নাই।" তাঁহাদের মতে চিতানল-পন্থায় পরলোকের দ্বারে দাঁড়াইলে পুণ্য পণে স্বর্গরাজ্যে অনন্তধাম ক্রয় করা যাইতে পারে; আর এ বাজার হইতে পাপের ভার বহন করিয়া চলিলে, ঘোর নরকে

নিপতিত হইতে হয়। তাই বলি, এই ভবের বাজারের বণিক মানুষ, এই ভব-পান্থশালার পান্থ নর, পরিণাম চিতানল ভাবিয়া এ বাজারে পুণ্য পণ্য ক্রয়ের চেষ্টা করিবে কি ?

শ্মশান! তুমি এত ভীষণ গম্ভীর কেন? তুমি এত ভীতিপ্রদ কেন? মানব তোমাকে রাক্ষস জ্ঞানে এত ভয় করে কেন? বুঝেছি তুমি সেই শেষ দিনের কথা মনে করিয়া দাও। তুমি এই ভবের খেলা ভাঙ্গিবার কথা মনে উদয় করিয়া দাও। মায়াময় সংসার, বাৎসল্যময় অপত্য, প্রেমময়ী প্রেয়সী প্রভৃতি সকলই ছাড়িতে হইবে, তোমার দর্শনে এই সকল স্মৃতি পটে উদয় হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, যে সকলের জন্য আমার আমার করিতেছি, সে সকল আর আমার থাকিবে না, যে সকল অনিত্য বস্তুকে নিত্য বস্তু জ্ঞানে নিয়ত যত্ন করিতেছি, সে সকল কেবল পথ ভুলাইয়া আমাদিগকে ভ্রমময় পথে ঘুরাইতেছে, এই সকল কথা তুমি মনে করিয়া দাও। থাক থাক, তুমি গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর, ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তিধারণ কর। তোমাকে দেখিয়া তবু এক এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছি—পাপের স্রোতে ভাসমান জীবনকে মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্ত স্থির করিয়া রাখিতেছি। বুঝিয়াছি, ভূতভাবন ভব শেষের সেই দিন নিয়ত মনে উদয় করিবার জন্য তোমাকেই তাঁহার প্রিয় বাসস্থান করিয়াছেন। তোমার গায়ে পতিত ভস্ম রাশিকে বিভূতি করিয়াছেন। তোমার গায়ে পতিত নর কপালই, তিনি পান পাত্র করিয়াছেন। শ্মশান! এমন মতি গতি কর, যেন তোমার অঙ্কে নির্ভয়ে স্থান লাভ করিতে পারি।
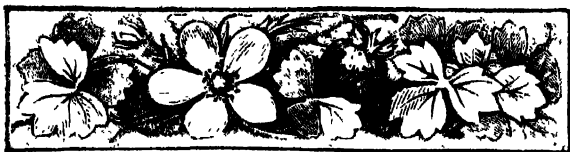
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গৃহে দারিদ্র্য রাক্ষস।

পাঠক, তুমি রামায়ণ মহাভারতে মহাকায়, করালবদন, বিশাল দশন রাক্ষসের বিবরণ পাঠ করিয়াছ। তুমি ভূগোলে নরমাংসভুক্ উলঙ্গ অসভ্য নরের বিবরণ পাঠ করিয়াছ। তুমি সমর-রাক্ষসের গোলা গুলির মুখে গজ-বাজী ও নরনারীর হননের বিবরণ পাঠ করিয়াছ। তুমি দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের করাল বদনে গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর নিপতিত হইবার বিবরণ শুনিয়াছ। তুমি মড়ক, জল, ভূমিকম্প, আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতিতে সহস্র সহস্র লোকের জীবননাশ-বৃত্তান্ত অবগত আছ। তুমি এই সব বিবরণ পাঠে কতই শঙ্কিত, ভীত ও দুঃখিত হইয়াছ। দারিদ্র্যমূর্ত্তিও কোথাও কোথাও অঙ্কিত দেখিয়াছ, কিন্তু তুমি

দারিদ্র্যরাক্ষসের কার্য্য দেখ নাই। আরও বলি, জনতাগত কার্য্যাপেক্ষা তোমার ব্যক্তিগত কার্য্যে সমবেদনা অধিক। নর অপেক্ষা নারীর ক্লেশে তোমার সমবেদনা অধিক। তোমার আকস্মিক স্বল্পকাল স্থায়ী ক্লেশের কার্য্যাপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্লেশের কার্য্যে কষ্ট অধিক। এ সব জানিয়াও যখন দীন পরিবারের ক্লেশের কাহিনী লিখিতে হস্ত প্রসারণ করিয়াছি, তখন আর হস্ত সঙ্কুচিত করিতে পারি না। সত্যের অপলাপ করিব না, তাহাও এ ক্ষুদ্র উপন্যাসের এক লক্ষ্য আছে। মহামায়ার— স্থায়ী অন্নক্লেশের তুমি অল্প সময়ের একটী দৃশ্য দেখ। তোমাকে মহামায়ার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল কান্দাইতেছি না, তুমি তাহার দুঃখে এক ফোঁটা মাত্র অশ্রু নেত্রপ্রান্তে আনিয়া সেই স্থানেই শুষ্ক কর। তুমি শিশু-সন্তান-পরিবেষ্টিত মহামায়ার প্রতি একবার দারিদ্র্য রাক্ষসের অত্যাচার দেখ। উঃ! দারিদ্র্যের কি বিকট মূর্ত্তি! অঙ্গে বসন নাই, কেশ ও শরীরে তৈল নাই, দেহে কিছুমাত্র লাবণ্য নাই। পেশী ও শিরাসকল সর্ব্বাঙ্গে বাহির হইয়া পড়িয়াছে. কোটর গত চক্ষুদ্বয় রক্ত বর্ণ —তাহা নিয়ত ঘন ঘন কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। বিশাল বদনে বিকট দশন সকল বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। চিবুক ও কপালের অস্থি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। বক্ষঃস্থলের অস্থিগুলি একে একে গণনা করা যাইতেছে। উদর শুকাইয়া এক খান শুষ্ক চর্ম্মের ন্যায় পৃষ্ঠ দেশের অস্থির সঙ্গে সংলগ্ন রহিয়াছে। হস্তদ্বয় ও চরণ যুগল দুই দুই খানি অস্থি যেন দুই দুই খানি ঢিলা চর্ম্মে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। পাদ দেশ শুষ্ক হইয়াছে, কণ্ঠ নালী উচ্চ হইয়া পড়িয়াছে। সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ঘন ঘন হাই ছাড়িতেছে, তাহার মুখব্যাদানে বোধ হইতেছে যেন, সে সকল ধরা-গ্রাস করিতে চাহিতেছে। রামধনের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

দারিদ্র্য রাক্ষস বিকট বদন ব্যাদান করিয়া স্থায়িরূপে মহামায়ার গৃহে উপস্থিত হইল। মহামায়া সন্তানগণের সহিত ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, ক্লেশ-তুষানলে মহামায়া দগ্ধ হইতে লাগিল।

ফাল্গুন মাসের দুই চারি দিন আছে; বেলা প্রায় আড়াই প্রহর অতীত হইয়াছে। বাসন্তী ফুল ফুটিয়াছে। ফল পাকিয়াছে। পাখী দেশে আসিয়াছে। আম্র মুকুল ঘিরিয়া ভ্রমর গুন্ গুন্ করিতেছে। পক্ক বদরী বেড়িয়া মাছি ভিন্ ভিন্ করিতেছে। পক্ক বেলের সুঘ্রাণে আকৃষ্ট হইয়া বায়সকুল নৈরাশ্য সূচক কাকা ধ্বনি করিতেছে। পত্রে অঙ্গ ঢাকিয়া কোকিল কুহু কুহু করিতেছে, শ্যামা বনে শীশ দিতেছে, দয়েল ও শালিক-দম্পতী বৃক্ষের শাখায় বসিয়া পরস্পরের গাত্র ঠোক্‌রাইতেছে। রৌদ্রের তাপ খুব প্রবল হইয়াছে। ধূলি বিভূতি মাখিয়া শুষ্কপত্রভূষণে সজ্জিত হইয়া পবন ঠাকুর মাতার অবাধ্য বালকের ন্যায় বড় ছুটাছুটি করিতেছেন। এমন সময়েও মহামায়ার পুত্রকন্যার সহিত আহার হয় নাই। পূর্ব্বদিনও আহার হয় নাই। মহামায়ার সে রূপ নাই, সে শরীর নাই। তিন চারি দিন হইতে বিনা লবণে সিদ্ধ নবপত্র ও টক কুল আহার করিয়াছিলেন।

মহামায়া লোকের নিকট দুঃখ জানাইতে পারিতেন না। তিনি লোকের নিকট কিছু চাহিয়া লইতে পারিতেন না। কেহ অযাচিত-ভাবে কিছু দান করিলেও, তিনি গ্রহণ করিতে লজ্জাবোধ করিতেন। তাঁহার বসন ভূষণ বিক্রয় করিয়া রামধনের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। গাভীটী বিক্রয় করিয়া রামধনের শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। থালা, ঘটী বিক্রয় করিয়া এতদিন আহার চলিয়াছিল। নিরুপায় হইয়া মহামায়া দাসী থাকিবার প্রয়াস পাইলেন। পাঁচটী লোকের আহার দিবার ভয়ে কেহ

তাঁহাকে দাসী রাখিলেন না। মধু ভৃত্য থাকিতে ও নির্ম্মলা দাসী হইতে যত্ন করিল; অল্প বয়সের বালক-বালিকা বলিয়া, কেহ তাহাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিল না। নির্ম্মলার বিবাহ দিয়া একটী গৃহজামাতা রাখার পরামর্শ হইল, কিন্তু পাঁচটী লোকের ভরণ-পোষণের ভার লইয়া কেহ গৃহজামাতা থাকিতে সম্মত হইল না। গ্রামে বড় লোক নাই। অনেকের মহামায়ার প্রতি দয়া থাকিলেও সেরূপ পাঁচটী লোক প্রতিপালন করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। প্রতিবেশিগণ মহামায়ার ক্লেশে কষ্ট পাইতে লাগিল, কোন উপায় করিতে পারিল না।

মহামায়া সম্পূর্ণ নিরুপায়, সম্পূর্ণ নিঃসহায়। পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা, হবিষ্য, অনিদ্রা, অনশন প্রভৃতিতে মহামায়ার স্তনে দুধ ছিল না। কেশব ক্ষুধায় ছটফট্ করিয়া কান্দিতেছিল। মাধব ক্ষুধায় ছটফট্ করিতেছিল। মহামায়া পতির উপদেশ স্মরণ করিয়া হরির চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিতেছিলেন, "ওহে অসহায়ের সহায়, নিরুপায়ের উপায়, কাঙালের হরি! আমি ইহাদিগকে লইয়া অনাহারে মরিলাম। কাঙ্গালিনার প্রতি কি দয়া হবেনা?" ক্ষুধায় নিপীড়িত নির্ম্মলা ও মধু মাতার সঙ্গে সঙ্গে হরিভজনা করিতেছিল। তাহাদের নয়ন হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল।

মধু হরির চরণে প্রণিপাত করিয়া ফলের বাগানের দিকে বাহির হইল। দয়াময় হরির দয়া অসাধারণ। একান্তমনে সরল হৃদয়ে দুরাশার বশবর্ত্তী না হইয়া ধর্ম্মসঙ্গত প্রার্থনা যাহা করা যাইবে, তাহাই তিনি পূরণ করিবেন। একান্তমনে হরিকে ডাকা—সে বড় সহজ ডাকা নহে। সে ডাক সকল সময়ে লোকে ডাকিতে পারে না। সে ডাক

কম ক্লেশে আসে না। এই কারণে লোককে আশ্বস্ত করিবার জন্য বালক ধ্রুবের সাধনার কালও দীর্ঘকাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রকৃত-পক্ষে সাধনা কালসাপেক্ষ নহে। একাগ্রতা, ভক্তি ও গাঢ় বিশ্বাস সাপেক্ষ। মধু ফলের বাগানে যাইয়া একটী দাড়িম্ব বৃক্ষে দুইটী সুপক্ক দাড়িম্ব পাইল। দাড়িম্ব দুইটী পাকিয়া ফাটিয়াছিল, অথচ পাখীতে ভক্ষণ করে নাই। সে একটী পেয়ারা গাছে দুইটী সুপক বৃহৎ পেয়ারা পাইল। চারিটী ফল লইয়া আসিবার সময়ে পথিমধ্যে তরকারীর বাগানে একটী ক্ষুদ্র মিষ্ট কুষ্মাণ্ডগাছের মধ্য লুক্কাইত একটী বৃহৎ কুষ্মাণ্ড পাইল। মধু ফলগুলি আনিয়া কেশবের নিকট রাখিল।

মায়ার আশ্চয্য কাণ্ড! দীনের গৃহে স্নেহের কি অপূর্ব্ব লীলা! ভালবাসা অট্টালিকা ছাড়িয়া দীনের কুটীরে বাস করেন। স্নেহ বিলাস-মন্দির ত্যাগ করিয়া, দরিদ্র শান্তিময় পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করে। ধনীর সম্পদ, দ্বেষ লোভ বিজড়িত ধন। দীনের সম্পদ দয়া, একতা ও চন্দন-চর্চ্চিত স্নেহ ভালবাসা। কেশব ফল খাইল না। সে' ফাটা দাড়িম্ব লইয়া একবার মায়ের মুখের নিকট, একবার দাদাদিগের মুখের নিকট একবার দিদির মুখের নিকট 'খা, খা' করিয়া ধরিয়া অভুক্ত কম্পিত কলেবর শিশু ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহামায়া বুঝিতে পারিয়া কহিলেন সকলে না খাইলে কেশব খাইবে না। ফল কাটিয়া সকলেই একটু একটু আহার করিল। বিনা লবণে কুষ্মাণ্ডসিদ্ধ আহারের আয়োজন লইল। নির্ম্মলা কুষ্মাণ্ড সিদ্ধ করিতে গেল।

কেশব ফল খাইয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বেড়াইতে বেড়াইতে দেওয়ালের একটী ক্ষুদ্র কুলঙ্গি হইতে একটী রৌপ্য মাদুলী বাহির করিল। মাদুলী দর্শনে মহামায়ার চক্ষে জল আসিল। মাদুলীটী

রামধনের হস্তে ছিল। তাঁহার মৃত্যুর দিনে কোন প্রতিবেশী মাদুলীটী খুলিয়া ঐ কুলঙ্গিতে রাখিয়া ছিলেন। ভ্রমবশতঃ তিনি মহামায়াকে সে কথা বলেন নাই।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মাদুলী বিক্রয় করা স্থির হইল। মধু এক স্বর্ণকারের নিকট মাদুলিটী ৵১০ সাড়ে তিন আনায় বিক্রয় করিল। তণ্ডুল অপেক্ষা সুলভ মূল্যে ক্ষুদ বিক্রীত হয় বলিয়া মধু ছয় পয়সার ক্ষুদ ও এক পয়সার লবণ ক্রয় করিয়া আনিল। মহামায়া সেদিন সন্তান-গণের সহিত ক্ষুদের যাউ ও সলবণ কুষ্মাণ্ডসিদ্ধ আহার করিয়া অতিবাহিত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
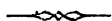
কালনার পোড়া-বাজার।

যেদিন মহামায়া ক্ষুদের যাউ আহার করিয়া দিন অতিবাহিত করিলেন, সে দিন রাত্রিকালে আর কিছু আহার করা হইল না। কাল কাহারও সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অবিরাম গতিতে যাইতেছে। সে দিনেরও সন্ধ্যা আসিল, বাসন্তী সন্ধ্যার ফুল সকল ফুটিল; বাসন্তী পাখীদল ডাকিয়া স্ব স্ব কুলায়ে গমন করিল। ভ্রমর মধু লইয়া, মক্ষিকা উদর পুরিয়া ভক্ষণ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিল; তারকামালায় পরিবেষ্টিত হইয়া চন্দ্রমা প্রকৃতির সসীমন্ত কবরীরূপ নীল নভস্তলের সিন্দূরবিন্দু ও কবরীভূষণ হইলেন। খদ্যোতিকাপুঞ্জ সুধাকরের প্রতিযোগিতায় স্ব স্ব আলোক প্রকাশ করিয়া উড্ডীন্ হইতে লাগিল;

বাসন্তী সন্ধ্যার বায়ু বহিল, স্বার্থত্যাগী পরোপকারী মহাপুরুষের ন্যায় বায়ু ফুলের গন্ধভার বহন করিয়া, জগতের লোকের নাসিকায় সেই সুগন্ধ দান করিয়া নিজের সমীরণ নাম সার্থক করিল। যাহাদের আহার নাই, তাহাদের রাত্রিতে কাজও নাই। মহামায়া সন্ধ্যা অতীত হইবার পরক্ষণেই সন্তানগণের সহিত শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া নিৰ্ম্মলা, মধু ও মহামায়ায় কত কথা হইল—অনেক তর্কবিতর্ক হইল। তাহাদের কথা এই ঃ--

নির্ম্মলা। বাড়ীতে থাকিয়া এইরূপ অনাহারে মরার চেয়ে যেখানে গিয়ে মরি সেই ভাল।

মধু। তাইত মা। আমরা কালই বাড়ী হ'তে যাই। হরি আছেন, তিনি কখন আমাদিগকে মারবেন না।

নিৰ্ম্মলা। মা! তোমার কি মনে নাই, বাবার শ্রাদ্ধ না যেতে মাখন দাদা, রাইচরণ খুড়া, শশী পিসী, সারদা মাসী যে আমাদের কলিকাতায় কাজ ক'রে দিতে চেয়েছিল! দেশে হউক, কলিকাতায় হউক, এক জায়গায় না এক জায়গায় কাজ জুটবেই জুটবে।

মধু। তাইত মা। কাজ জুটবে। মাইনে না পাই, আমরা নয় পেটে খেয়েই কাজ করব।

নিৰ্ম্মলা। আমরা যদি পেটে খেয়ে থেকেও কোনখানে বাঁচি, সেও লাভ। সেদিন অম্বিকা কাকাদের বাটীর ঠাকুরদাদা বল্লেন, "তোমার পাঁচ পেট, তোমায় কাজ দেবে কে মা! তোমরা দুই তিন পেট হলেও পেট ভাতায় কোন স্থানে কাজ ক'রে দিতে পা'রতেম।

মধু। উপোসে উপোসে সকলে মরার চেয়ে চাকরির চেষ্টা করা কি ভাল নয়?

নির্ম্মলা। বাবা মরবার সময় ব'লে গিয়েছেন, "হরি আছেন।" তুমিও বল, হরির কত মহিমা! আজই হরি পেয়ারা, দাড়িম, কুমড়া ও মাদুলী দিলেন। যদি হরি না দিতেন, তাহ'লে আমরা এতক্ষণ অজ্ঞান হ'য়ে পড়তেম।

মধু। মা, হরি কাজ নিশ্চয় দিবেন। কেঁদনা, নিশ্চয়ই দিবেন। তুমি সন্তুষ্ট হ'য়ে আমাদিগকে যেতে দাও।

নির্ম্মলা ও মধুর কথায় মহামায়া যে এতক্ষণ কাঁদিতেছিলেন, তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছিল। মহামায়া ক্রন্দন হইতে বিরত হইয়া উত্তর করিলেন—তোরা যেতে চাস্ যা, আর উপায় নাই; সকল সময় হরিকে ডাকিস এবং আমিও তোদের জন্য হরিকে ডাক্‌ব, তবে যাবার পূর্ব্বে কাহারও কাহারও নিকট এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়। এই কথা বলিয়া মহামায়া পুনরায় কাঁদিলেন।

নির্ম্মলা। কাকেও জিজ্ঞাসা করিলে, যাওয়া হবে না। এক এক-জনে এক এক কথা বলবে। কেউ বল্‌বে, ছেলেমানুষ, কেউ ব'লবে আইবুড় মেয়ে।

বাসন্তী উষা আসিল, আবার পাখী ডাকিল, ফুল ফুটিল পবন ছুটিল। মহামায়া প্রাতেই ক্ষুদের যাউ ও কুষ্মাণ্ডসিদ্ধ করিলেন। কিছু ক্ষুদ ভাজিলেন। মহামায়ার সন্তানগণ আহার করিল। দুইখানি করিয়া ছিন্ন বস্ত্র, দুটী পয়সা ও কিছু ক্ষুদ ভাজা সম্বল লইয়া নির্ম্মলা ও মধু বিদেশে চাকরী করিবার চেষ্টায় বাহির হইল। মহামায়া কতকদূর পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে আসিয়া অনিমেষনেত্রে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেন। তাহারাও যতক্ষণ মাতা ও ভ্রাতৃগণকে দেখা যায়, ততক্ষণ চলিতে চলিতে মাতা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল।

মহামায়া, অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। নির্ম্মলা ও মধু কাঁদিল না। মহামায়া গৃহে আসিয়া ক্রন্দনের রোল উঠাইলেন। অনেক প্রতিবেশী মহামায়ার গৃহে আসিলেন। মহামায়ার ক্রন্দনের কারণ শুনিলেন। কিন্তু অনেকেই নির্ম্মলা ও মধুকে আর ফিরাইয়া আনিতে বলিলেন না। কেহ কেহ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"নির্ম্মলের মা, তোমার ভালই হ'লো। নির্ম্মলা ও মধু, হরির দয়ায় কাজ পাবে। তুমি গ্রামের মধ্যে কোন বাড়ী খেটেখুটে খেয়ে প্রাণে বাঁচ্‌তে পার্‌বে। কেঁদনা, কেঁদনা, ঈশ্বর ভাল কর্‌বেন।"

নির্ম্মলা ও মধু যথাসাধ্য দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল। এবং রাস্তার নিকটবর্ত্তী গ্রামে কার্য্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পথশ্রান্তা ভগ্নীর মুখের দিকে ভ্রাতা ও ভ্রাতার মুখের দিকে ভগ্নী দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। একের পরিশ্রমে উভয়ে বৃক্ষমূলে বিশ্রাম, একের পিপাসায় উভয়ে জলাশয়ে জলপান ও একের ক্ষুধায় উভয়ে সেই ক্ষুদ ভাজা আহার করিতে লাগিল। পথিমধ্যে তাহারা কোন গ্রামে কার্য্য পাইল না। কেহ হীনবেশ, কেহ অপরিচিত ক্ষুদ্রকায় দুর্ব্বল বালক-বালিকা বলিয়া তাহাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিলেন না এবং কাহারও বা তাহাদিগের কার্য্যের প্রয়োজন ছিল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহারা কালনার বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরি! হরি! কালনার বাজারে একখানাও গৃহ নাই। অদ্য তিন দিন হইল, কালনার বাজার পুড়িয়া গিয়াছে। বিদেশী নিঃসহায় বালক বালিকা এখন দাঁড়ায় কোথায়?

হরি! তোমার জীব, এখন তুমিই কোলে তুলিয়া লও। তোমার

অপার মহিমাময় সুকৌশল সম্পন্ন বিশালরাজ্যের ক্ষুদ্র রহস্য ভেদ করাও মানববুদ্ধির অতীত।

অনেক বলিবেন, এত অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা কি চাকুরির অন্বেষণে বিদেশে যায়? পেটের জ্বালা বড় ভয়ঙ্কর জ্বালা। দুর্ভিক্ষের অত্যাচার অতি বিষম অত্যাচার। যাঁহারা মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন ভীষণ দুর্ভিক্ষের বিবরণ জানেন, তাঁহারা আর এ বালক বালিকার বিদেশ যাত্রা বিস্ময়কর মনে করিবেন না। ক্ষুধানলে লোককে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য করে; সে অনলে দাম্পত্যপ্রেম, সন্তানবাৎসল্য, গুরুভক্তি, প্রভৃতি সকলই দগ্ধ করিয়া ফেলে। পেটের জ্বালায় যুবক যুবতী স্ত্রীকে বিক্রয় করিতেছে! মাতা প্রাণসম পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে! সন্তান পিতামাতাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। পেটের জ্বালা জাত্যভিমান দূর করিতেছে, সমাজবন্ধন শিথিল করিয়া ফেলিতেছে। এ জ্বালা শত্রু মিত্র ভেদাভেদ জ্ঞান নষ্ট করিতেছে; মান অভিমান, দম্ভ, মাৎসর্য্যকে চূর্ণ করিতেছে; জন্মভূমি, জন্মস্থান ও বাসভবন পরিত্যাগ করাইতেছে। এ জ্বালায় যিনি ভুক্তভোগী নহেন, তিনি ইহার ভাব কিছুই বুঝিবেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দোকান দারী।

ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে? তিনি যেমন নিরাকার, নির্ব্বিকার, তাঁহার কার্য্যও তেমনি নির্ব্বিকার ও দোষশূন্য। মানব ভ্রান্ত, তাই তাঁহার এক কর্ম্মকে ভাল বলিতেছে, ও অপর কর্ম্মকে মন্দ বলিতেছে, তৃতীয় কর্ম্মের জন্য তাঁহাকে সহস্র তিরস্কার করিতেছে। ভাল মন্দের আমরা বুঝি কি? ভাল মন্দই বা কি? সুখ দুঃখই বা কি? কেবল কার্য্যের নামান্তর মাত্র—কেবল চিত্তের অবস্থান্তর মাত্র—কেবল নরবুদ্ধির ভ্রান্তি মাত্র। সুখও যা, দুঃখও তাই। ধন থাকাও যা, দারিদ্র্যও তাই। কটূক্তিও যা, মিষ্ট ভাষও তাই। আমরা ভ্রান্তিবশতঃ কু-সু, 'ভাল-মন্দ ভেদাভেদ করি। স্থূলজ্ঞানে ভেদাভেদ, সূক্ষ্মজ্ঞানে সবই সমান। তাই দেবাদিদেব মহাদেবের চন্দনে ভস্মে, শ্মশানে স্বর্গে,

বিষে অমৃতে তুল্যজ্ঞান ছিল। এই কারণেই তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। ভেক তাহার ক্ষুদ্রদৃষ্টিতে যেটুকু দেখে, নর তদপেক্ষা অধিক দেখে, হস্তী তদপেক্ষা আরও অধিক দেখে।

দৃষ্টির দূরতা লইয়া দ্রষ্টব্য বস্তুর জ্ঞান অধিক জন্মে। ঈশ্বর ত্রিকাল-দর্শী, সর্ব্বদর্শী। তাঁহার জ্ঞানে ও নরের জ্ঞানে সমতা হয় না। তাঁহার জ্ঞানে যাহা ঘটে, তাহা কখন ভ্রান্ত বা অনিষ্টকর নহে। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী মঙ্গলময় পিতা। তিনি তাঁহার সন্তানের মঙ্গলামঙ্গল যত ভাল বুঝেন, তত ভাল আর কে বুঝিতে পারে? হইতে পারে, মানব পিতার দুষ্ট সন্তানের প্রতি বেত্রাঘাতের ন্যায় তিনিও কখন কখন পাপী নরকে পীড়ন করিয়া থাকেন। সেও কি মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় ইচ্ছা নহে?

পুড়ুক, কালনার বাজার। হউক, বালকবালিকার আশু ক্লেশ। মঙ্গলময় ঈশ্বরের দীর্ঘদৃষ্টি কোন মঙ্গল দেখিয়াই তাহাদিগকে কালনার পোড়া বাজারে আনিয়াছেন। বালক বালিকা কালনার পোড়াবাজার দেখিয়া প্রথমতঃ বড় হতাশ হইল। তাহারা ভগবানকে ডাকিয়া ইতস্ততঃ কোন গৃহের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহারা বাজারের এক প্রান্তে এক আমকাঁঠালের বাগানের নিকটে একখানি নূতন গৃহ দেখিতে পাইল। এইখানিই বাজারের মধ্যে এক মাত্র গৃহ। এখানি এক মুদির গৃহ। মুদির গৃহের সমুদায় দ্রব্যাদি বাহির হইয়াছিল। কেবল গৃহখানি পুড়িয়াছিল। মুদির বাটীতে একখানি নূতন ঘর বাঁধা ছিল। সে সেই ঘর উঠাইয়া আনিয়াছে। তাহার গৃহের সমস্ত কার্য্যই হইয়াছে। কেবল গৃহখানি লেপা পোঁচা হইলেই সে দোকান সাজাইতে পারে। দোকানদার সারাদিন খাটিয়া,

গৃহকার্য্য শেষ করিয়া ঘরামীদিগকে লইয়া তাহাদিগের প্রাপ্য হিসাব ও ধূমপান করিতেছিল। বালক বালিকা সেই দোকানার নিকট আগমন করিয়া তাহার গৃহে রাত্রি যাপনের প্রার্থনা জানাইল। দোকানী প্রথমে চটিয়া উঠিল, পরে যখন তাহারা বলিল, তাহার গৃহ লেপিয়া পুঁছিয়া দিবে, তখন দোকানদার উপহাস করিয়া তাহাদিগকে অগ্রে ঘর লেপিতে পুঁছিতে বলিল। নির্ম্মলা কুদাল লইয়া মাটি কাটিতে আরম্ভ করিল ও মধু ক্ষুদ্র কলসী লইয়া নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে গেল। দোকানীর হিসাব হইতে হইতে তাহারা বারান্দার দুইটা খুঁটীর গোড়ে সুন্দররূপে মাটি লাগাইল। দোকানী তখন উপহাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি খুঁটীর গোড়ে মাটি দিয়া ঘর লেপিতে পুঁছিতে পারিবে?"

নির্ম্মলা উত্তর করিল—পারিব।

দো। তোমরা কি জাত? আমার ভাত খাইবে?

মধু। মোরা কৈবর্ত্ত। আপনি কি জাত?

দো। আমি সদ্‌গোপ।

মধু। মোরা সৎগোপের ভাত খেয়ে থাকি। আপনার ভাত খাইব।

দো। আমি তবে হাত পা ধুয়ে পাক করিতে যাই। আমি আলো দিচ্ছি, তোমরা ঘরখানি সার। আমি ঐ আমতলায় ছাপড়ার মধ্যে দোকানের জিনিষপত্র রেখেছি, ঐখানেই পাক করব।

নির্ম্মলা ও মধু সুন্দররূপে দোকানীর ঘরখানি সারিল। পোড়া মাটি লেপিতে লেপিতেই দোকান ঘর শুকাইয়া উঠিল। অনন্তর তাহারা আম্রতরুর তলায় যাইয়া দোকানীর প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন আহার করিল।

রাত্রি ১১টার মধ্যে আম্রবৃক্ষতলস্থ দোকানীর দোকানের দ্রব্যাদি দোকানে সাজাইয়া দোকানী দুইটী বাক্সের উপরে এবং নির্ম্মলা ও মধু গৃহের মেজেতে মাদুর বিস্তার করিয়া শয়ন করিল। শয়নান্তে দোকানী বালক বালিকার পরিচয় লইল। দোকানী তাহাদের কার্য্যে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের দুঃখের কাহিনী শ্রবণে বড় সদয় হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে দোকানীর নূতন গৃহে অনেক দোকানী ধূমপান করিতে আসিল ও বালক-বালিকার পরিচয় লইল। প্রথম দোকানী তাহাদের কার্য্য-কুশলতার পরিচয় দিল। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল-ওয়ের কার্য্যে অনেক জন মজুর নিযুক্ত ছিল; সুতরাং কালনার পোড়া-বাজারের দোকানদারগণের গৃহনির্ম্মাণের লোক পাওয়া বড় কঠিন হইয়াছিল। এ সময়ে তাহাদের আহারের জোগাড় ও সামান্য সামান্য কার্য্য করিবার লোকেরও অভাব ছিল। অনেক দোকানী বালক-বালিকাকে আহার ও দিন প্রতি এক আনা মজুরী দিয়া কার্য্য করাইতে প্রস্তুত হইল। প্রথম দিনে তাহারা এক আনা করিয়া মজুরীতেই কার্য্য করিল। দ্বিতীয় দিন হইতে তাহাদের দুইজনের চারি আনা মজুরী সাব্যস্ত হইল এবং দোকানদারগণ সাদরে তাহাদিগকে কার্য্যে নিয়োজিত করিতে লাগিল।

ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ তাহারা এই বাজারের এ দোকানে ও দোকানে কার্য্য করিল। তাহাতে তাহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল, তাহা তাহাদের প্রথম পরিচিত দোকানীর নিকট রাখিতে লাগিল। অনেকেই তাহাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বস্ত্রাদিও তাহাদিগকে দান করিতে লাগিল। বাজারের সকলেই তাহাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিল। বাজারের দোকানদারগণ রহস্য করিয়া নির্ম্মলাকে

মাসী ও মধুকে মামা বলিতে লাগিল। নির্ম্মলা মাসী ও মধুমামা কালনার বাজারে বিখ্যাত হইয়া পড়িল।

এই কালনার বাজারে জাড়গ্রামের রামচন্দ্র দাস বৈরাগী ওরফে বৈষ্ণব বাবাজী মধ্যে মধ্যে আসিতেন। তিনি বয়সে প্রাচীন। জাড়গ্রামের অনেক স্ত্রীলোকেও তাঁহার সহিত কথা কহিত। বাবাজী বিশ্বাসী ও সচ্চরিত্র লোক ছিলেন। মহামায়া বাবাজীকে বাবাঠাকুর বলিতেন। রামচন্দ্র কালনার বাজার হইতে মালা, ঘুন্সী, চিরুণী, আয়না, কৌটা প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিতেন। নির্ম্মলা ও মধু কালনার বাজারে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা মধ্যে মধ্যে বাবাজীকে দিয়া মায়ের নিকট পাঠাইয়া দিত, এবং তাঁহার নিকট মায়ের কুশল-সংবাদ জানিত। আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে কালনার বাজারের গৃহ সংস্করণ কার্য্য শেষ হইয়া গেল, ঠাকুরদাস নামক এক বণিক বালক বালিকাকে স্থায়িরূপে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাদের প্রত্যেককে খোরাক পোষাক ও মাসিক এক টাকা করিয়া বেতন দিতে সম্মত হইল। তাহারা দোকানের কার্য্য করিতে আপাততঃ সম্মত হইল বটে, কিন্তু বলিল, আগামী দুর্গাপূজার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে কলিকাতায় যাইতে হইবে এবং তথায় তাহাদের অধিক বেতনে কার্য্য হইবে। ঠাকুরদাস নিজেই তাহাদিগকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন; কিন্তু কহিলেন, তাহাদিগের কলিকাতায় কার্য্য না হইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ঠাকুরদাসের সন্তানসন্ততি ছিল না, তিনি ইহাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ইহাদের কলিকাতায় কার্য্য হইবে না সুতরাং পুনরায় বাধ্য হইয়া তাহার সহিত ফিরিয়া আসিবে।

ঠাকুরদাসের দোকানে মধুকে দোকানদারী করিতে হইত এবং নির্ম্মলাকে গৃহ পরিষ্কার ও পাকের যোগাড় করিতে হইত। মধু দোকানের কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলভাবে করিত। অল্পদিনের মধ্যে তাহার প্রতি লোকের এত বিশ্বাস জন্মিল যে, সে অল্প সময়ের মধ্যে দ্রব্যাদি দিতে পারিত ও তাহার সহিত কেহ দ্রব্যাদির দরদাম করিত না। তাহার এক পয়সা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত মূল্যের মসলা, মিশ্রি ও কুইনাইনের পোঁটলা বাঁধাই থাকিত। মধু দোকানের কার্য্যশেষ করিয়া সময় পাইয়া লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিল। নির্ম্মলা তাহার নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, ভ্রাতার সাহায্য করিয়া, উলের কার্য্য ও নানা-প্রকার শিল্প কার্য্য করিতে লাগিল। ঠাকুরদাস বালক-বালিকার উপর দোকানের ভার দিয়া নিশ্চিন্তমনে বাকি টাকাকড়ি আদায়ের চেষ্টা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঠাকুরদাসের তাগাদার ধূমে দোকানের বহুকালের বাকি টাকা আদায় হইতে লাগিল। বাকি টাকা আদায়ে পোড়ার ক্ষতি ঠাকুরদাস বড় অনুভব করিলেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহামায়ার দাসীবৃত্তি।

পাঠক, তুমি মহাজন না খাতক? তুমি এ দুয়ের কেহ হইলে বড় অসুখী। তুমি যদি এ দুয়ের কেহ না হও, কাহারও ধারও না, কাহাকে ধারাও না, এরূপ লোক হও, তবে তুমি বেশ সুখী। যদি মহাজন হও, তবে তুমি টাকা আদায় করিতে না পারিয়া দুঃখী। আর যদি তুমি খাতক হও, তবে তুমি টাকা না দিতে পারিয়া অসুখী। যদি তুমি মহাজন হও, তবে তুমি সঞ্চিত অর্থ ও অনাদায়ী অর্থের জন্য নিদ্রাশূন্য। আর যদি তুমি খাতক হও, তবে তুমি সুদের চিন্তায় নিদ্রাহীন। যদি মহাজন হও, তবে তুমি ইসপ্সফেবলে প্লূটাস্ প্রদর্শিত কৃপণদৃষ্ট বিভীষিকার ন্যায় বিভীষিকা দর্শনে ভীত হইতেছ। আর যদি তুমি খাতক হও, তবে মহাজনরূপ বিশ্বামিত্র মূর্ত্তি ভাবিয়া, হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় কম্পিত-

কলেবর হইতেছ। মহাজন অর্থচিন্তা-বিষাদ মলিনমুখে কালাতিপাত করিতেছেন। আর খাতক ঋণ চিন্তা তুষানলে দগ্ধ হইতেছেন। মহাজনের এইটুকু ভাল যে, তাঁহার বাক্য-বিষে জর্জ্জরিত হইতে হয় না ও উত্তমর্ণের ভ্রুকুটী-ভীষণ মুখ দর্শন করিতে হয় না। খাতকের বড় জ্বালা! খাতক একে ঋণের চিন্তায় অস্থির, তাহার উপর মাহাজনের সেই মধুর মুখখানি--সে মুখখানি স্মরণ হইলে শরীর কম্পিত হয়, হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, মাথা ঘুরিয়া যায়। পোড়ামুখ সে মুখাপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল। বেগুণবেচা মুখ বলে, সে মুখও তদপেক্ষা ভাল। ভ্রূকুটিসমন্বিত রামানুচরের মুখও তদপেক্ষা ভাল। ইংরাজ প্রভুর কালা বাঙ্গালীর প্রতি কোপভীষণ মুখও তদপেক্ষা ভাল। সে মুখ নদীয়ার কারিকরে গড়িতে পারে না, সে মুখ ইটালীর চিত্রকরে চিত্র করিতে পারে না, সে মুখ ফটোগ্রাফে উঠে না, সে মুখ গ্রন্থকার গ্রন্থে বর্ণনা করিতে পারে না। আর সে মুখের ভাষা যে কত মধুময়, কত সুধাময়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারে না। সাগরমন্থনে যতটুকু সুধা উঠেছিল, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে এখন যতটুকু সুধা আছে, কবিগণের কাব্যে ও ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে, নাটক প্রণেতার নাটকে এবং বিজ্ঞানে, দর্শনে গণিতে, জ্যোতিষে, ইতিহাসে, স্মৃতিতে, শ্রুতিতে, আইনে যতটুকু মধু বিকাশ পায়, ততটুকু সুধা বা মধু মহাজনের ভাষায় সম্পূর্ণরূপে বিকাশ পায়। মরি! মরি! মরি! কিবা স্বর, কিবা মুখভঙ্গি, কিবা ভ্রূকুটি কিবা আস্যব্যাদান কিবা দশন-সংস্থাপন, কিবা অক্ষি-সঞ্চালন, কিবা অঙ্গ পরিচালন! বিধাতঃ! তুমি কি তোমার কারুকার্য্যের সর্ব্বনৈপুণ্য একাধারে দেখাইবার জন্য—সকল নরক একাধারে ঘনীভূত করিয়া দেখাইবার জন্য, নির্জ্জনে বসিয়া

কায়মনে, প্রাণপণে মহাজনের মোহিনী মূর্ত্তিখানি গড়িয়াছিলে? খাতক! তোমার আর নরকভোগ হইবে না। তোমার সকল নরকের ভোগ এইখানেই হইল। তুমি কুম্ভীপাক, রৌরব, পুন্নাম প্রভৃতি সব নরক এক স্থানে দেখিতেছ। যে দিন মহাজন তোমাকে তলব দেন, সেইদিন জানিলে, আজ তোমার কুম্ভীপাকের ভোগ হইল। যেদিন তোমার কড়ারের দিন অতীত হইল, সেইদিন জানিলে, রৌরব তোমার হাতে হাতে। যেদিন তোমার কিস্তিখেলাপ হইল, সেই দিন জানিলে তোমার পুন্নাম নরকভোগের আর বাকি নাই।

মহাজন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যেরূপ সুন্দর, সেইরূপ সুন্দর মহাজন হতভাগা বঙ্গদেশে অতি বিরল। সেইরূপ প্রকৃত সাধু মহাজন বিপন্নের আশ্রয়, অসহায়ের সহায়, নির্ধনীর বল। অধুনা বঙ্গদেশে মহাজন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধনদন্তের সংখ্যাই অধিক। যাঁহারা পুরুষ পুরুষানুক্রমে ব্যবসায়ী মহাজন, যাঁহারা বহুকাল যাবৎ সুবর্ণচন্দ্রের সুগোল চন্দ্রবদন অবলোকন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাহার পিতামহ ভিক্ষান্ন দ্বারা জঠরানল নির্ব্বাপিত করিয়াছে, যাহার পিতা পরস্কন্ধভারস্বরূপে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে, যে নিজে দীর্ঘকাল যাবৎ সামান্য কার্য্য করিয়া অর্দ্ধাশনে বা অনশনে থাকিয়া স্ত্রী-পুত্রদিগকে অশন বসনের ক্লেশ দিয়া শাস্ত্রসমাজাদিষ্ট ক্রিয়াকলাপ কৌশলে বর্জ্জন করিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতার দ্বারা অভিনব সম্পত্তিসম্পন্ন হইয়াছে, এস্থলে সেই সকল মহাজনপদবাচ্য পিশাচদিগের কথা বর্ণিত হইল। শেষোক্ত মহাজনগণ অর্থ আদায় করিতে যেরূপ লালায়িত, ঋণ দিতেও সেইরূপ ব্যাকুলচিত্ত। তাহাদিগের সঞ্চিত অর্থের কুসীদ দুই দিনের জন্য বন্ধ হইলেও তাহারা উন্মত্তপ্রায় হয়। তাহারা ঋণদানের

বেলায়, মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী অপেক্ষাও বড়লোক হইয়া উঠে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কখন তাহারা কোন টাকা আপনার টাকা বলিয়া স্বীকার করে না। এই শ্রেণীর উত্তমর্ণ ঋণদানের কালে ইহার, উহার, তাহার তহবিল হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার ভানে আপনাকে যেন অধমর্ণের পরম সুহৃদ জানাইয়া দান করে। অর্থ দিবার সম্পূর্ণ আশা দিয়া উৎকৃষ্ট দলিল লইয়া অধমর্ণের অর্থের প্রয়োজনের অন্তিম সময়ে অর্থাৎ যৎকালে তাহার আর অপর উত্তমর্ণের অনুসন্ধানের সময় থাকে না, তখন ঋণের অর্থ দিতে অগ্রসর হয়। অধমর্ণের যদি কোন কালের কোন অর্থ লইয়া এই শ্রেণীর পিশাচের সঙ্গে হিসাব থাকে, তবে সেই হিসাবের ছলে কিছু না কিছু অর্থ কর্ত্তন করিয়া লইবে, অথবা অন্যূন তিন মাসের অগ্রিম সুদ দেয় ঋণ হইতে কর্ত্তন করিয়া লইবে। এই শ্রেণীর ধর্ম্মহীন, বিশ্বাসশূন্য ভদ্র-ভাববর্জ্জিত, চক্ষু-লজ্জাবিহীন মহাজনপদবাচ্য পিশাচগণই দেশের প্রকৃত কণ্টক। ইহাদিগের সংসর্গ বিসধর সর্পসংসর্গবৎ পরিত্যাজ্য, ইহাদের সমাজ হাঙ্গর কুম্ভীর সমাকুল স্রোতস্বতীবৎ পরিহার্য্য, ইহাদের অর্থের জন্য অকরণীয় কার্য্য কিছুই নাই। ইহারা দয়া মমতাশূন্য, কালাকাল জ্ঞানশূন্য, সম্পদ-বিপদ বিবেচনাশূন্য, নিন্দা-অপবাদের ভয়শূন্য। অর্থ ইহাদিগের মন, প্রাণ, জীবন, অন্তঃকরণ, হৃৎপিণ্ড, সর্ব্বকর্ম্মেন্দ্রিয়, সর্ব্ব জ্ঞানেন্দ্রিয়, ত্বক্, মাংস, শোণিত, অস্থি। অর্থই ইহাদের স্বপ্নের বিষয়, অর্থ আহরণই ইহাদের জীবনের কর্ম্ম, অর্থ চিন্তাই ইহাদের চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী ধ্যান ও অর্থ সংবর্দ্ধনই জীবনের একমাত্র মুখ্যব্রত। অর্থই ইহাদের উপাস্য দেবতা ও ইহারা অর্থের ক্রীতদাস।

মহামায়া একদিকে ঋণের নরকে হাবুডুবু খাইতেছেন, অন্যদিকে দারিদ্র্য দংশনে পিষ্ট হইতেছেন। একদিন, দুইদিন, তিন দিনের মধ্যে

নির্ম্মলা মধু ফিরিল না. খবরও আসিল না ; আজ তাহার মহাজন দে মহাশয় তলব দিয়া পাঠাইলেন, সারাদিন ধান ভানাইলেন। সন্ধ্যাকালে অভুক্ত মহামায়াকে একমুঠা ক্ষুদ দিয়া বিদায় করিলেন। কা'ল তাহার মহাজন ঘোষ মহাশয় ডাকাইলেন সারাদিন ঘুঠা ভাঙ্গাইলেন, সন্ধ্যাকালে অভুক্ত মহামায়াকে একমুঠা মুড়ি দিয়া বিদায় করিলেন ; পরশ্ব অপর মহাজন রায় মহাশয়ের দরবারে মহামায়াকে উপস্থিত হইতে হইল। সারাদিন কাষ্ঠ আহরণ করিতে হইল, সন্ধ্যাকালে অভুক্ত মহামায়া একবাটী ফেন পাইয়া বিদায় হইলেন। একে বিদেশগত-সন্তান-চিন্তায় অস্থির, তাহাতে আবার মহামায়া দুইটি শিশুসন্তান লইয়া অনাহারে এরূপে খাটিয়া আর কত দিন বাঁচিবে ?

গ্রামের হলধর মুখোপাধ্যায় ঠাকুর প্রাচীন ও বড় দয়ালু ; তিনি কলিকাতায় থাকেন, কল্য রাত্রে বাড়ী আসিয়াছেন। মহামায়া গ্রাম সম্পর্কে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে শ্বশুরভাবে সম্বোধন করিত। দেখা যাউক, মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহামায়ার কি ব্যবস্থা করেন। মুখোপাধ্যায়ের বয়স ৭৫ অথবা ৭৬ বৎসর ; লোকটি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; তাঁহার শরীর নাতিদীর্ঘ, নাতিক্ষুদ্র এবং নাতিসূক্ষ্ম, নাতিস্থূল। তাঁহার কেশ, ভ্রূ, গোঁফ ও দাড়ীর একটি কেশও অপক্ক নাই, সকলগুলিই সুপক্ক। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নীর বয়স ৭০ বা ৭১ বৎসর। তিনিও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আকৃতির লোক। তবে তাঁহার অঙ্গযষ্টি কিছু ক্ষীণতর। আর এক প্রভেদ এই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কেশগুলি সব সুপক্ক হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার দন্ত একটিও নষ্ট হয় নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নীর কেশগুলি এখনও আষাঢ়ের ঘনঘটার ন্যায় গাঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ আছে, কিন্তু তাঁহার একটীও দন্ত নাই। আর শুনা

গিয়াছে, উভয়েরই বর্ণ একরূপ ছিল। এক্ষণে বয়সের আধিক্যবশতঃ বর্ণে মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাকা মাকাল ফল ও তদীয় পত্নী পাকা আম্রের ন্যায় হইয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে কয়েক দিন বাড়ীতে থাকিতেন, গৃহিণী সে কয়েক দিন সর্ব্বদাই তাঁহার পার্শ্বে বিরাজ করিতেন। এই বৃদ্ধ দম্পতী পারাবত দম্পতীর ন্যায় বাস করিতেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহার প্রশংসা করিতেন, গৃহিণীও তাহার প্রশংসা করিতেন; আর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহার নিন্দা করিতেন, গৃহিণীও তাহার নিন্দা করিতেন। এই দম্পতীর মধ্যে প্রায়ই প্রণয়-কলহ হইত। গৃহিণী নয়টা না বাজিতে কর্ত্তাকে স্নান করিবার জন্য বড় বিরক্ত করিতেন। যে দিন গৃহিণীকে চটাইবার ইচ্ছা থাকিত, সেদিন গৃহিণীকে বলিলেন, বুড়ো বামনের এত সকাল স্নান করা সাজে না। বুড়ীরও বুড়োর স্নানের জন্য এত আগ্রহ করা বড় লজ্জার কথা। আর যেদিন গৃহিণীকে ভুলাইবার ইচ্ছা থাকিত সেদিন কোন গল্প করিতে বা শুনিতে আরম্ভ করিতেন। গৃহিণী নয়টায় বারটা বাজিলেও ঠিক পাইতেন না। গৃহিণীর সকলই গুণ ছিল, দোষের মধ্যে এই ছিল যে, তাঁহাকে বা কর্ত্তাকে বুড়ী বা বুড়া বলিলে সহ্য হইত না; বার্দ্ধক্যে কর্ত্তার চুল পাকিয়াছে ও তাঁহার দন্ত পড়িয়াছে, এ কথায় তিনি সম্মত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, কর্ত্তাদের বংশে শৈশবে চুল পাকার ও তাহার পিতৃবংশে দন্ত পড়ার একটা রোগ আছে। গৃহিণী মুখ ঢাকিয়া রাখিতেন এবং দন্তহীনস্বরে কর্ত্তা ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় লোকের সহিত অল্প কথা বলিতেন। কর্ত্তার গৃহিণীকে ক্ষেপাইবার আর একটি উপায় ছিল, কর্ত্তা যদি দন্তহীনস্বরে দুই চারিটি কথা বলিতেন, তাহা হইলে আর গৃহিণীর ক্রোধের সীমা থাকিত না।

গৃহিণীর মনে করিয়া ছিলেন, গ্রামের সকল সংবাদ তিনি আগে কর্ত্তাকে বলিবেন। অপর কেহ কোন সংবাদ আগে যদি কর্ত্তাকে বলিয়া ফেলিত, তাহা হইলে তিনি বিশেষ রুষ্ট হইতেন। এবার গ্রামের মধ্যে প্রধান সংবাদ মহামায়ার বিধবা হওয়া ও তাহার অন্নকষ্ট। যে রাত্রে কর্ত্তা বাটী আসিয়াছিলেন, সেই রাত্রেই মহামায়ার বিবরণ কর্ত্তাকে বলিয়াছেন ও কত অশ্রুপাত করিয়াছেন। পরদিন সন্ধ্যার পরে ঠাকুর ঠাকুরাণী এক স্থানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মহামায়া পুত্রদ্বয়ের সহিত আসিয়া, ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মহামায়াকে চিনিতে পারিলেন না, গৃহিণী তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—"কাল এত ব'লেছি, এতেও চিন্‌তে পার্‌লে না ? এ যে নির্ম্মলার মা ! ওর কপাল পুড়েছে, রামধন আর এ সংসারে নাই। নির্ম্মল ও মধু খেতে না পেয়ে কোথায় চ'লে গিয়েছে ; নির্ম্মলের মাকে আর এখন চেনবার যো নাই, সে শরীরও নাই, সেরূপও নাই। এই কথা বলিতে বলিতে গৃহিণীর চক্ষে জল আসিল।

কর্ত্তার চক্ষেও জল আসিল। তিনি বলিলেন, "তুমি কেন ওর ছেলে মেয়েকে খেতে দাও নাই ? দু টাকা ধার দিলেও ত পার্‌তে ?"

গৃহিণী। ও পোড়াকপালীর মেয়ে কাকে কি কিছু বলে ? তুমি বাড়ী আস্‌বে শুনে, আজ তিনদিন আমার কাছে আস্‌ছে। রামধন বড় কাহিল হ'লে, একদিন আমি দেখ্‌তে গিয়েছিলেম, আর একদিন একটু চড়্‌চড়ী দিতে গিয়েছিলেম। অভাগার মেয়ে যদি আমার কাছে আস্‌তো, তা'হলে কি ওর ছেলে মেয়ে বাড়ী থেকে যায় ?

কর্ত্তা। এখন উপায় কি ? কি করা যায় ?

গৃহিণী। ওর শুধু তিনটি পেটত নয়, আরও দেনা আছে।

কর্ত্তা। কত টাকার দেনা?

গৃহিণী। এক কুড়ি পনর টাকা ছয় আনা (বলা বাহুল্য, গৃহিণী কুড়ীর বেশী গণিতে পারিতেন না)।

কর্ত্তা। এখন কি করা যাবে?

গৃহিণী। ভাল, আমি কি বলব? তুমি পুরুষমানুষ, তুমি যা ভাল বোঝা, তাই কর। ওর একটা কিছু কর্‌তেই হবে। ওর যে কয়েক টাকা দেনা আছে, তার জন্যে ওর মহাজনেরা বিরক্ত কর্‌ছে। দে, ঘোষ, রায় সকলেই ওকে ডেকে পাঠায়, সারাদিন খাটায়, সন্ধ্যাকালে একটু কেন বা একমুষ্টি ক্ষুদ দেয়। তারা ভেবেছে, ও টাকা দিতে পারবে না। ও যদি ভাল মেয়ে না হ্‌ত, টাকা ধারিনা বল্‌ত, তাহ'লে তারা একে খেয়ে ফে'লত, কত কটু ব'লত। কাজ না ক'রে দিলে কত গালাগালি দেয়।

কর্ত্তা। তবে আমি ওর পঁয়ত্রিশ টাকা ছয় আনা দেনা শোধ ক'রে দেব। আর ও আমাদের বাড়ী কাজ কর্ম্ম করবে, আমি ওদের তিন জনকে খেতে পর্‌তে দেব।

গৃহিণী। তোমার টাকা শোধ যাবে কিসে? মাইনে টাইনে কিছু দেবে না?

কর্ত্তা। মাইনে আর আপাততঃ কিছু দিচ্ছি না, টাকার সুদ নেবো না, কালে কস্মিনে যদি টাকা শোধ দিতে পারে, তবে ভাল! না পারে, যা হয় পরে করা যাবে।

গৃহিণী। তুমি ত বিষমুখ ক'রে ওর কাছে টাকা চাবে না?

কর্ত্তা। যতদিন দিতে না পারে, ততদিন আর চাব না।

গৃহিণী মহামায়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাছা, এতে কি রাজি আছ?" মহামায়া মস্তক নত করিয়া সম্মতি জানাইলেন।

এই কথোপকথনের পর মহামায়া মুখোপাধ্যায়-গৃহে দাসী হইলেন। তিনি মুখোপাধ্যায় গৃহে-দিনে কাজ করিয়া রাত্রিকালে বাটী যাইতেন। যখন নির্ম্মলা ও মধুর অনুসন্ধান হইল এবং বৈরাগী ঠাকুর তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থ আনিয়া দিতে লাগিলেন, তখন মহামায়া তাহা মুখোপাধ্যায়-গৃহিণীকে দিতে লাগিলেন। মহামায়ার উপবাস ক্লেশ দূর হইল।
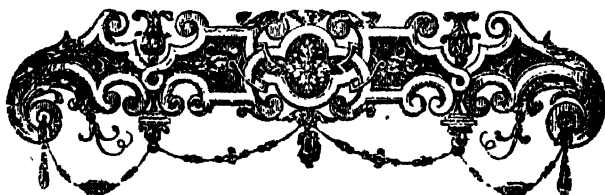
নবম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় প্রথম রজনী।

১২৭৩ সালের ভাদ্রমাসের শেষভাগ। আকাশ মেঘে পরিপূর্ণ। কয়েকবার মূষলধারে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখন বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার ভারী বৃষ্টি হইবার সম্ভব। প্রবল বায়ুবেগে বৃহৎ বৃহৎ মেঘ সকল এদিকে ওদিকে সঞ্চালিত হইতেছে। কলিকাতার রাস্তা জল ও কর্দ্দমময়। ঘুড়ি-গাড়িগুলি অশ্বের গুণে জলকাদা ছিটাইয়া, সবেগে গমন করিতেছে। ছ্যাকরা গাড়িগুলি থ্যাচ্ থ্যাচ্—প্যাচ্ প্যাচ্ করিতে করিতে ধীরে ধীরে যাইতেছে। সহস্র কশাঘাতে ও গালিবর্ষণে অশ্বের গতি কিছুমাত্র ক্ষিপ্রতর হইতেছে না। সেদিন ঘড়ী ভিন্ন বেলা ঠিক করিবার উপায় ছিল না। বিহগকুলের কুলায়-গমনের সান্ধ্যরব ছিল

না, ফেরিওয়ালার চীৎকার ছিল না। কলিকাতার রাস্তায় লোকজনও অধিক ছিলনা।

এই সময়ে কলিকাতার রাস্তায় একটী বালক ও একটা বালিকা বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া প্রথমে মুদির দোকান অনুসন্ধান করিতেছিল। যখন জানিল, কলিকাতায় মুদির দোকান নাই, অপর কোন দোকানে থাকিবারও উপায় নাই, তখন তাহারা বড় হতাশ হইয়া পড়িল। এই বালক-বালিকাই মধু ও নির্ম্মলা। ইহারা সেই কালনার বাজারের বণিকের সহিত কলিকাতায় আসিয়াছে। বণিক মনোহর দাসের চকে আছে। বালক-বালিকাকে চাকরীর অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া দিয়াছে, "চাকরী না পাইলে, পথ ভুলিয়া গেলে, অথবা রাত্রি হইয়া পড়িলে, গাড়ী করিয়া আমার নিকটে আসিবে।" বালক-বালিকার তাহার নিকটে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল না। তাহাদের ইচ্ছা, কলিকাতাতেই চাকরীর সুবিধা করিয়া লইবে। বণিক ভাবিয়াছিল, তাহাদের কলিকাতায় কোন কাজ কর্ম্ম হইবে না, তাহারা ক্লেশ পাইয়া আবার তাহারই নিকট ফিরিয়া যাইবে। বণিক তাহাদিগকে ভাল বাসিত ও বিশ্বাস করিত ; কিন্তু তাহারা লেখা পড়া শেখে, কি তাহাদের কোনরূপ উন্নতি হয়, বণিকের সেরূপ ইচ্ছা ছিল না। বালক বালিকার ইচ্ছা, তাহারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া মাতা ও ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্নকষ্ট নিবারণ করিবে এবং লেখাপড়া শিখিয়া আপনাদের উন্নতি করিবে।

কলিকাতায় মুদির দোকান না পাইয়া তাহারা রাত্রি অতিবাহিত করিবার জন্য প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে একটু স্থানের প্রার্থনা করিতেছিল। কিন্তু কোথাও একটু স্থান পাইল না। মহানগরী কলিকাতা! তুমি যেমন ধনৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী, দয়া ধর্ম্মের শিক্ষাদাত্রী,

বিশ্বাস ও ন্যায়পরতার উপদেশকারিণী, তুমি তেমনি নিষ্ঠুরতার শ্রেষ্ঠ-ক্ষেত্র, তুমি অবিশ্বাসের রঙ্গভূমি, অন্যায় অধর্ম্মের বিরাজভূমি। তোমা-তেই স্বর্গ, নরক সমান্তরালভাবে বিরাজ করিতেছে। তোমার ন্যায় মহানগরীতে এই অনাথ বালক-বালিকাকে বিশ্বাস করিয়া কেহ আশ্রয় দিতেছে না; কিন্তু তোমার অন্যতর স্থানে গৃহস্থ কিছু ভাড়া পাইবার আশায় অজ্ঞাত-নাম-ধাম এক ব্যক্তিকে আপন বাসগৃহ ছাড়িয়া দিয়া স্থানান্তরে বাস করিতেছে। বালক বালিকা রাত্রি ৮টার মধ্যে কোন গৃহস্থের দ্বারে কোন সুবিধা করিতে পারিল না। বরং যে যে বড়লোকের দ্বারে দ্বারবান্ ছিল, সেই সকল স্থানে কোথাও তিরস্কৃত, কোথাও উপ-হসিত এবং কোথাও বা তাড়িত হইল। রাত্রি ৮টার সময় মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ ১৭১ নং ভবনের দ্বারে অশ্রুজল বিমোচন করিতে করিতে দ্বার-বানের নিকট তাহারা তাহাদের প্রার্থনা জানাইল। দ্বারবান তাহা-দিগকে দ্বারে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাবুর নিকট এতলা করিতে গমন করিল।

এই বাড়ীটী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বাবু উমেশ চন্দ্র দত্তের বাড়ী। ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যান। উমেশ বাবু সুপ্রসিদ্ধ জজ্ রসময় দত্তের স্বজন। ইনি বেঙ্গল থিয়েটারের স্থাপয়িতা সুপ্রসিদ্ধ ছাতুবাবুর ভাগিনেয় শরৎ বাবুর ভগিনীপতি। উমেশ বাবু দয়ালু ও সদাশয় লোক। দ্বারবানকে বলা ছিল, কোন লোক বিপদাপন্ন হইয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহার নিকট এতলা করিতে হইবে। দ্বারবান, বাবুর নিকট এতলা করিল। বাবু তাহাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া আসিতে বলিলেন। নির্ম্মলা ও মধু দ্বারবানের সঙ্গে বাবুর নিকট উপস্থিত হইল।

উমেশ বাবু তাহাদের পরিচয় লইলেন ও তাহাদের দুঃখের কথা শুনিলেন। তিনি একটি টাকা তাহাদিগের হাতে দিয়া দ্বারবানকে দোকান হইতে জল খাওয়াইয়া আনাইয়া চাকরের দ্বারা শয়ন স্থান করাইয়া দিতে বলিলেন। তিনি দ্বারবানকে আরও বলিয়া দিলেন, বালক-বালিকা যেন তাঁহাকে না জানাইয়া স্থানান্তরে গমন না করে।

পরদিন প্রাতঃকালে বালক-বালিকা বাবুর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার প্রত্যেক চাকর চাকরাণীকে তাহাদের আহার দিবার কথা বলিলেন। বাবু নিজে আহারের ব্যয় দিতে প্রস্তুত হইলেন। কোন চাকর চাকরাণী তাহাদিগের আহার দিতে সম্মত হইল না। অগত্যা বাবু তাহাদিগকে আর একটা টাকা দিয়া বিদায় করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, তাহাদিগের যে কয়েক দিন চাকরী না হইবে, তাহারা বাবুর বাটীতে শয়নের স্থান পাইবে। তিনি তাহাদিগকে আরও বুঝাইয়া বলিলেন—"তিনি খ্রীষ্টান, যদিও তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মণ পাচকে পাক করে, তথাপি তাঁহার বাটীতে আহার করিলে, তাহাদের সমাজের ভয় আছে। এই কারণে তিনি তাহাদিগকে রাখিতে সাহস করেন না। বালক-বালিকা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আবার সহরে বাহির হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় দ্বিতীয় রজনী।

কলিকাতা! তোমার ন্যায় লোকের উন্নতি করার স্থান ভারতে আর নাই। তুমি শিক্ষার নিকেতন, বণিকের হট্ট, ব্যবসায়ের আবাস, শিল্পের আগার, কাজকর্ম্মের বাসভূমি। যাহার যেমন সাধনা, তাহার তেমনই ফল। ইংরাজী শিক্ষা কর, এল্ এল্ ডি হইবে। সংস্কৃত পড়, বিদ্যাসাগর হইবে। ব্যবসা কর, ব্যবসায়-চূড়ামণি হইবে। বাণিজ্য কর, বণিকরাজ হইবে। মুটিয়া হও, পরে মুটিয়ার সর্দ্দার হইবে। চাকরী আরম্ভ কর, প্রধান চাকুরে হইবে। তোমাতে নিরক্ষর মূর্খ আসিয়া পণ্ডিত হইতেছে। বড় সূঁচ দড়ি হাতে করিয়া বস্তাবন্দীকারক আসিয়া কোটীশ্বর হইতেছে। উমেদার আসিয়া প্রধান চাকুরে হইতেছে।

সামান্য ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী আসিয়া সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসাদার হইতেছে। নির্দ্ধন বণিক আসিয়া বণিক-চূড়ামণি হইতেছে। শ্রম, যত্ন, অধ্যবসায়, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরতা, চরিত্রবল ও ধর্ম্মবল, এই কয়েকটা সম্বল যাহাদের আছে, তাহারা তোমার কোড়ে আশ্রয় লইয়া কিছু না কিছু করিতে পারিবেই পারিবে।

কলিকাতা! তুমি সকলের সকল গৌরব নষ্ট করিবারও প্রধান স্থান। ধন, বিদ্যা, শিল্পনৈপুণ্য, ব্যবসায়-দক্ষতা, বাণিজ্যপটুতা, তোমাতে অনেকের লোপও পাইয়া যাইতেছে। তুমি সহজে লোকের চরিত্র নষ্ট করিতে পার। তুমি লোকের সকল গুণ মুহূর্ত্তকালে গ্রাস করিতে পার। তোমাতে ধনী আসিয়া পথের ফকির হইতেছে। যশস্বী পণ্ডিত আসিয়া নিন্দিত মাতাল হইতেছে। গুণী শিল্পী, জ্ঞানী, ব্যবসায়ী, কার্য্যকুশল বণিক আসিয়া ঘৃণিত পাষণ্ড হইতেছে। তোমাতে চোর আসিয়া সাধু হইতেছে, সাধু আসিয়া চোর হইতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক, অগঠিত-চরিত্র নির্ম্মলা ও মধু আসিয়া তোমার জলবায়ু মৃত্তিকার গুণে কি হইয়া উঠে।

দত্ত বাবুর বাটী হইতে বালক-বালিকা কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইল। মনে মনে তাহারা সকল দেবদেবীর পদে কোটী কোটী প্রণাম করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির প্রার্থনা করিল। মাতার মুখে শ্রুত পিতৃবাক্য মনে করিয়া হরিনাম জপ করিতে করিতে কলিকাতার রাস্তায় চলিতে লাগিল। তাহাদের হৃদয় থর থর কাঁপিতে লাগিল। যাহারা নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় কোন প্রধান অভীষ্টসিদ্ধির জন্য পরিণত বয়সেও দূর-দেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই অপরিণতবয়স্ক বালক-বালিকার মনের ক্লেশ ও চিন্তা বুঝিতে পারিবেন।

রামধনের মৃত্যুর পর মহামায়া ও এই বালক-বালিকাকে অনেকে অনেক আশা দিয়াছিল। বৰ্দ্ধমান অঞ্চলের অনেক চাকর চাকরাণী কলিকাতায় কার্য্য করে। ক্ষীরদা, মানদা, জ্ঞানদা, রাম, শ্যাম হরি তাহাদিগকে অনেক আশা দিয়াছিল। তাহারা অনেকের ঠিকানা মুখস্থ করিয়াছিল। নিস্তারিণী মাসী নিমতলার রাস্তার ১৩ নং বাড়ীতে থাকে। ক্ষীরদা পিসী হরি ঘোষের গলির ১২ নং বাটীতে থাকে। রাম কাকা দর্জ্জিপাড়ার ৭৭ নং বাড়ীতে কাজ করে। হরিপিসী মসজিদ বাড়ী, ৭১ নং বাড়ীতে থাকে। অদৃষ্টক্রমে এই সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া তাহারা তাহাদের কাহাকেও পাইল না। কেহ চাকরী ছাড়িয়া গিয়াছে, কেহ বাড়ী গিয়াছে, কেহ চুরি করিয়া পলাইয়াছে, কেহ বা কোন গুরুতর পাপের জন্য তাড়িত হইয়াছে।

দ্বিতীয় দিনও বেলা চারিটার মধ্যে তাহাদের কিছু আহার হইল না এবং কোন স্থানে কিছু কাজ কর্ম্মেরও সুবিধা হইল না। চারিটার পরে দুই পয়সার মুড়ি মুড়কি কিনিয়া ভ্রাতা ভগিনীতে আহার করিল এবং একটী কলে জল পান করিল।

বেলা পাঁচটা বাজিয়া গেলে বালক-বালিকা গ্রে ষ্ট্রীট যেখানে চিৎপুর রোডকে কাটিয়াছে, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিল, একটী উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বাবু সেই-স্থানে আসিয়া একটু দাঁড়াইলেন। অপর আর একটী ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিল। কথোপ-কথনে বালক-বালিকা বুঝিল, প্রথম বাবুটী অতি দয়ালু লোক, দ্বিতীয় ব্যক্তির কথায় ইহাও প্রকাশ পাইয়াছিল, তিনি বড়লোকের সন্তান।

উক্ত কথোপকথনে সাহসী হইয়া বালক-বালিকা সেই বাবুর নিকট-বর্ত্তী হইয়া বাবুকে কহিল, "বাবুজী মশাই! মোরা গরিবের ছেলে,

বাপ নাই, এই সহরে খেটে খেতে এয়েছি, আজ দুই দিনের মধ্যে চাক্‌রি জুটিল না।'

বাবু। তোমাদের বাড়ী কোথায়?

নির্ম্মলা। বৰ্দ্ধমান জেলায়।

বাবু। কি জাতি?

নির্ম্মলা। মোরা কৈবৰ্ত্ত দাস।

বালক-বালিকার মুখশ্রী বড় মলিন ছিল। তাহাদের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, তাহারা কিছু আহার করে নাই। তাহাদের দীন বেশ, মলিন মুখ দেখিয়াই বাবুর দয়া হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের খাওয়া হয়েছে কি?"

মধু। আজ্ঞা ভাত খাওয়া হয়নি, চ্যান হয়নি, তবে মুড়ি মুড়কি খেয়েছি।

বাবু। তোমরা মিঠাই সন্দেশ কিছু খাবে?

মধু। আজ্ঞা না, মিঠাই সন্দেশ খাবার ইচ্ছা নাই।

বাবু। তোমরা কি কাজ কর্‌তে পার?

মধু। আমার দিদি ঝির সব কাজ করিতে পারে, আমিও চাকরের সব কাজ কর্‌তে পারি, তবে বড় কল্‌সী ক'রে জল আন্‌তে পারি না, আর ভারী মোট নিতে পারি না।

বাবু। এস, তবে এস, আমার সঙ্গে এস। বালক-বালিকা পূর্ব্বেই জানিয়াছিল, বাবু জাতিতে ব্রাহ্মণ, বাবুর নাম রাধিকাচরণ লাহিড়ী। ইনি হোগলকুঁড়ে নিবাসী ভোলানাথ লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র ও গুরুদাস লাহিড়ী মহাশয়ের পৌত্র। এই সময়ে বাবুর পিতা পিতামহ উভয়েই জীবিত ছিলেন। বাবুরা ধনী বড়লোক ও গোঁড়া হিন্দু। বাবুর বাটীতে

অতিথিসেবা আছে ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কাঙ্গালী দুঃখীর যথেষ্ট দান আছে। রাধিকা বাবু আজ শ্বশুরবাড়ী যাইতেছেন। বালক-বালিকাকেও সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিলেন।

কলিকাতার রীতি আছে; স্ত্রী শ্বশুরালয়ে থাকিলে, জামাতৃগণকে শনিবারে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হয়। যে সকল জামাতৃগণ এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য না করেন, তাঁহারা স্ত্রীসমাজে কলুষিত চরিত্রের লোক বলিয়া ঘৃণাস্পদ হয়েন। রাধিকা বাবুও এই রীত্যানুসারে শ্বশুর-বাটী যাইতেছেন, ইঁহার শ্বশুরবাড়ী কলিকাতাস্থ কুমারটুলিতে। রাধিকা বাবুর শ্বশুরশাশুড়ী জীবিত ছিলেন। তাঁহার প্রথম শ্বশুর-বাড়ীর কথা এস্থলে বলা হইতেছে।

বালক-বালিকা লইয়া রাধিকা বাবু শ্বশুর বাটী পৌছিলেন। নির্ম্মলা অন্তঃপুরে গিয়া পরিচিতা পরিচারিকার ন্যায় কর্ম্ম করিয়া সকলকে প্রীত করিল এবং মধু বিনা অনুমতিতে স্বেচ্ছাক্রমে রাধিকার দাদা-শ্বশুরকে বারবার ধূমপান করাইয়া ও তাঁহার বৈঠকখানার আলবোলা ও হুক্কা পরিস্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন করিয়া বৃদ্ধকে পরিতুষ্ট করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা-ভগ্নী ছাড়াছাড়ি।

সরোজিনী। না-না-না, তা কিছুতেই হবে না·

রাধিকা। তা হবে। না হলেই হবে না।

সরো। কিসে হবে?

রাধি। সত্ব।

সরো। কিসের সত্ব?

রাধি। যাতে সত্ব হয়, তারি সত্ব।

সরো। আমসত্ব। দেখ, হবে এখন কাঁটালের সত্ব।

রাধি। আমের আম সত্বই হবে।

সরো। তবে যাও, বাটি কেন গে।

রাধি। (অন্যমনস্কতায় সকল না শুনিয়া) কিসের বাটি?

সরো। দুধে আমসত্ত্ব খাবার কাঁসা, রূপা বা পাথরের বাটি।

রাধি। তা কিনিব এখন।

সরো। আঁব যে আবার নিতান্ত কচি। এঠেবে, গোবরাবে, পাকবে, মজবে, তবে ত সত্ত্ব।

রাধি। যা, পাগলের মত বকিস্ না।

সরো। আমিত পাগলের মতই বকি। তুমি খুব ভাল বল। বাবা মা এই সন্ধ্যাকালে বলেছেন, মেয়েটীকে দেওয়া হবে না। তাঁদের কথা শুন্‌বে না, আমার কথা শুন্‌বে না, তোমার জিদই বজায় থাক্‌বে? গুরুজনের কথা শুন্‌বে না, আমার কথা শুনবে না, আপন মনে আপনি কাজ কর্‌বে, সেই হ'লো ভাল বকুনি, আর আমি গুরুজনের কথা শুন্‌তে বল্‌ছি, সে হ'লো পাগলামো। এই বেশ কথা।

রাধি। তাঁরা যদি নিতান্ত না ছাড়েন, আর ওরা যদি রাজী হয়, তবে না হয়, মেয়েটি থাক্‌বে।

সরো। তবে এই পথে এসো।

রাধি। পথ ছাড়া হলুম কবে?

সরো। পথ ছাড়তে পা'র্‌লে কি বাকি রাখ? হাতে পায়ে নাকে কাণে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি, তাই ছুট্‌তে চাও।

রাধি। কিসের দড়ি?

সরো। টোনের শক্ত দড়ী, খোসামোদের দড়ী, অনুগত থাকার দড়ী।

রাধি। তা নয়, এক দড়ী দিয়ে বেঁধেছ, সে দড়ী চোক দিয়ে মন বেঁধেছে। এক্ষণে খোরাক দাও, তবে দড়ী টিক্‌বে, না হয় ছিঁড়ে বেরতে হবে।

সরো। তুমি কোন্ দড়ীর কথা ব'ল্‌ছ?

রাধি। রূপের দড়ী আর গুণের খোরাকীর কথা বলছি।

সরোজিনী পরমরূপবতী ও বুদ্ধিমতী সতী ছিলেন। তাঁহার শরীরের বর্ণ আলতা-মিশ্রিত দুগ্ধ সদৃশ ছিল। তাঁহার অঙ্গ ঈষৎ স্থূল ও কোমল ছিল। তাঁহার মস্তকে জলদজালের ন্যায় কুন্তলপাশ প্রলম্বিত হইয়া জানুদেশ চুম্বন করিত। তাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত ভৃঙ্গারূঢ় সরসিজ-সদৃশ নেত্রযুগল বুদ্ধিমত্তা ও সতীত্ব-প্রভা প্রকাশ করিত। তাঁহার অতুলনীয় নাসিকা, রক্তিম ওষ্ঠাধর, মুক্তাপঙক্তির ন্যায় দন্তশ্রেণী, প্রশস্ত ললাট, সুন্দর গণ্ডদেশ ও চিবুকের স্থির ভাব অবলোকন করিলে, তাঁহার মুখমূর্ত্তি দেবীমুখ বলিয়া ভ্রম হইত। তাঁহার কোমল ভুজমৃণালদ্বয়, উচ্চ বক্ষঃস্থল, ক্ষীণকটি, স্থূল নিতম্ব, করিশুণ্ড-সদৃশ ঊরুদেশ অতীব প্রশংসনীয় ছিল। তিনি রাধিকা বাবুর শেষোক্ত কথায় লজ্জিতা হইয়া কথা বিষয়ান্তরে লইলেন।

সরোজিনী বলিলেন, "বাস্তবিক এত ছোট মেয়ে, এত কর্ম্মা দেখি নাই। বেশ পান সাজে, বাসন মাজে, কুট্‌না কোটে, বাট্‌না বাটে, ঘরদ্বার পরিষ্কার করে, বিছানা ঝাড়ে,ছেলে মেয়েও বেশ রাখতে পারে। ছোট খোকা একদিনের মধ্যে কেমন বাধ্য হয়েছে।"

রবিবার রাত্রির প্রথম ভাগে রাধিকাবাবু ও তাঁহার পত্নী সরোজিনীর মধ্যে এই কথোপকথন হইল। নির্ম্মলাকে রাধিকা বাটীতে রাখিবেন, এই প্রসঙ্গক্রমে যে যে কথা হইয়াছে, তাহা পাঠক অবগত আছেন। সত্য সত্য পরদিন প্রাতঃকালে রাধিকা বাটী যাইবার সময় নির্ম্মলাকে পাইলেন না। নির্ম্মলা রাধিকার শাশুড়ীর নিকট থাকিতে সম্মত হইল।

রাধিকাবাবুর দাদা-শ্বশুর অতি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি রাধিকাকে কহিলেন, "মধু বড় ভাল ছোক্‌রা। আমার ইচ্ছা ছিল, ওকে রাখ্‌ব। বৌমা যখন মেয়েটীকে রাখলেন, তখন মধুকে রাখা আমার ভাল দেখায় না। তুমি রাস্তা হ'তে উহাদিগকে নিয়ে এসেছ, আচ্ছা, ছোকরাকে তুমিই ল'য়ে যাও। এই কথার পর রাধিকাবাবু মধুকে লইয়া গৃহে যাত্রা করিলেন।

ভ্রাতাভগিনীতে ছাড়াছাড়ি হইল। ভ্রাতা ভগিনীর ছাড়াছাড়ি কি ক্লেশময় ছাড়াছাড়ি! ভ্রাতা ভগিনী এক বৃন্তের যুগল পুষ্প। ভ্রাতা ভগিনী এক ডালার গাঁথা মালা। ভ্রাতা ভগিনী এক দেব-উপাসনার কুসুমাঞ্জলি। ভ্রাতা ভগিনী একে অন্যের আশ্রয়, সহায়, স্নেহের পাত্র। জন্মাবধি যাহাদের পরস্পর একত্র ভোজন, শয়ন; ক্রীড়া, কৌতুক, গমন, ভ্রমণ, তাহাদের ছাড়াছাড়িতে যে মনভাঙ্গা, হৃদয়ভাঙ্গা, ক্লেশের উৎপত্তি হয়, তাহার কতটুকু উপন্যাসের পাতে অঙ্কিত হইতে পারে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।
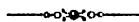
পিতামহ-পৌত্রে।

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা হিন্দুর উপাসনার প্রশস্ত সময়। খ্রীষ্টানও প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মেরও এই দুই সময়ে উপাসনার রীতি আছে। মুসলমান এই দুই সময়ে ত উপাসনা করেনই, আরও অনেক সময়ে উপাসনা করিয়া থাকেন। হিন্দু ভিন্ন অপর জাতির উপাসনা কথায়, হিন্দুর উপাসনা কথায় ও উপচারে। বিশ্বাস ও ভক্তি সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই উপাসনার সাধারণ ধন। দেবতার অধিকতর সামীপ্যে, অধিকতর বিশ্বাসে, অধিকতর ভালবাসায়, উপচারের প্রয়োজন!

বৃদ্ধ গুরুদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা-বন্দনাদি যথো-পচারে সমাপন করিয়া, যে গৃহে পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে আসি-লেন, রাধিকাবাবু মধুকে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহে উপনীত হইলেন। বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার পৌত্রদিগকে বড় কুটুম্ব বলিয়া সম্বোধন করি-তেন, অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে শ্যালক বলিতেন। তিনি রাধিকা বাবুকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "কিহে মধ্যম বড়কুটুম্ব! কোথা হ'তে এলে ?"

রাধিকা লজ্জিত ও বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "কুমারটুলি হইতে।'

গুরুদাস। শ্বশুর-বাড়ী হতে ?

রা। আজ্ঞা হাঁ।

গু। এই কি শ্বশুর-বাড়ী হ'তে আসার চেহারা? টেড়ীর চুল একটী নড়ে নাই, চোক বসে নাই, লাল হয় নাই. জামার ইস্তিরি ভাঙ্গে নাই, কোঁচা ভাঙ্গে নাই, কাপড়ে চূণ-কালী নাই। এখনকার শ্বশুরবাড়ী আর শ্বশুর বাড়ী নাই—আফিসে যাওয়া হ'য়েছে। কাপড়ে হলুদ, চূণ, কালী কিছু দেয় না, শরীরে বেদনা হয় না, এরূপ শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া কি শ্বশুর বাড়ী ?

রা (মৃদুস্বরে) দিদি কি মার্‌তেন না কি ?

গু। সে মারুক আর না মারুক, পাঁচজনে মা'রের বড় কর্‌তো, সেও স্পষ্টত না মার্‌লে প্রকারান্তরে মারিত বল্‌তে পারি।

রা। তিনি কি আপনার সঙ্গে বলে পার্‌তেন ?

গু। তার গায়ে যেমনি বল ছিল, আমার গায়েও তেমনি বল ছিল। আমরা কি তোদের মত টোকার ঘায়ে প'ড়ে মর্‌তুম? আমি বড়

নারিকেল গাছে উঠতে পার্‌তুম। ডাব নারিকেল কিলিয়ে ভেঙ্গে খেতে পার্‌তুম। আর তোদের দিদি ছোট ছোট জল পোরা জালা তুল্‌তে পার্‌তো। পাঁচ শ লোকের ভাত একা রেঁধে দিতে পার্‌তো। সেকালে এখনকার মত ঘরে ঘরে বামন থাকত না। গৃহস্থের ঝি বৌয়ে কাজ কর্‌তো, পাক করতো। তখন শুনেছি, এই কলিকাতায় দত্ত বাড়ীতে, ছাতুবাবুর বাড়ীতে, আর শোভাবাজারের রাজবাটীতে বামন ছিল।

রা। সে খুব ভাল সময় ছিল।

গু। তার আর কথা! এত বাবুগিরী তখন ছিলনা, এত ডাক্তার কবিরাজ তখন লাগ্‌ত না। তখন ধাত্রী মোটেই কলিকাতায় ছিল না। তখন দেশী ধায়েই নাড়া কাট্‌ত। দেশ উচ্ছন্ন গেল, রসাতলে গেল।

রা। তা, ঠিক।

গু। এখন বল দেখি, কি জন্যে এসেছিস?

রা। এসেছি এই ছোক্‌রার জন্যে।

গু। ও ছোক্‌রা কে?

রা। ও ছোক্‌রা জেতে কৈবর্ত্ত, বড় গরীব, বাপ নাই, কলিকাতায় খেটে খেতে এয়েছে। সব কাজ বেশ করতে পারে। দুদিন কুমারটুলির দাদার কাছে কাজ কর্ম্ম এত ভাল করেছিল যে, তিনি ওকে ছেড়ে দিতে চান নাই।

গু। আমাদের কি কোন চাকরের অভাব আছে?

রা। বাড়ীতে কোন চাকরের অভাব নাই। আপনার আফিসে যে লোকটা তামাক সাজতো, সে লোকটাত অনেক দিন নাই এবে আফিসে তামাক সাজবার জন্য এনেছি।

গু। তা বেশ, তবে আজ হ'তে আমার সঙ্গে আফিসে যাবে। এই

কথোপকথনের পর সেইদিন হ'তেই মধু গুরুদাস বাবুর আফিসে তামাকু সাজিতে যাইতে লাগিল। গুরুদাস বাবু এক বড় হৌসের মুচ্ছদ্দিগণের মধ্যে একজন সুবিখ্যাত মুচ্ছদ্দি। তাঁহার বিলক্ষণ মানসম্ভ্রম ছিল, যাঁহারা তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তিনি ধূমপান করেন না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, পূর্ব্বে তিনি ধূমপান করিতেন।

মধু হৌসে গিয়া নিম্নতলস্থ তামাকু সাজিবার ঘর ও জলের কল দেখিয়া লইল। সে হৌসের আলবোলা, হুক্কা, কলিকা, তামাক, টিকা, গুল পাইল। প্রথমে সে ধূমপানের কামরাটী দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আলবোলা ও হুক্কাগুলি পরিষ্কার করিয়া—মাজিয়া ঘসিয়া জল পুরিল। সেই গৃহের আসনগুলি ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করিল। বালকের কার্য্যে গুরুদাস বাবু ও তদধীন কর্ম্মচারিগণ সুখী হইলেন

দ্বিতীয় দিন হইতে হৌসে তামাকু সাজিয়াও মধু বিলক্ষণ সময় পাইতে লাগিল। সে কালনার পোড়াবাজারে থাকিতেই বণিকের দোকানে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়াছিল। এক্ষণে সে যথেষ্ট অবসর পাইয়া কেরাণী-বাবুগণের সাহায্যে মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে লাগিল।

মধু হৌসে তামাকু সাজিত এবং গুরুদাস বাবুর বাটীতে আহার করিত। সে গুরুদাস বাবুর বাটীর স্ত্রীলোকদিগের কথানুসারে কার্য্য করায়, তাঁহারাও তাহাকে বিলক্ষণ ভাল বাসিতেন। মধুর সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য রাধিকা বাবুর আন্তরিক যত্ন ছিল। মধুর জুতা, জামা, ছাতা, ধুতি, চাদর ইত্যাদি যখন যাহা প্রয়োজন হইত, রাধিকা বাবু তাহা গুরুদাস বাবুর নিকট হইতে চাহিয়া দিতেন। মধুর প্রথম দিনের পোষাক পাইবার ঘটনাটী এস্থানে বিবৃত হইতেছে।

যে সোমবারে মধু গুরুদাস বাবুর বাটীতে আইসে, সেই সপ্তাহের

শনিবারে রাধিকা বাবু শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় মধুকে সঙ্গে লইবার অভিলাষী হন। দেখিলেন; মধুর পরিচ্ছদ মলিন। তিনি বৃদ্ধ পিতামহের নিকট যাইয়া বলিলেন, "দাদা! আপনার নিন্দা হ'ল।"

বৃদ্ধ গুরুদাস একটু চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিসে গা বড় কুটুম্ব? কিসে?"

রাধিকা বলিলেন, "এই যে মধু ছোকরাকে আপনি রেখেছেন, একে নিয়ে আফিসেও বেরুচ্ছেন, কিন্তু এর পোষাকের দিকে আপনার একেবারে দৃষ্টি নাই। সাহেবেরা আপনাকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করিবে।"

গুরু। চাকর বাকরের পোষাকের দিকেও যদি আমি দৃষ্টি করবো, তবে তোরা আছিস কি জন্যে? সাহেবদের নিন্দা প্রশংসা আমি ধরি না। পিতৃহীন বালক আমার নিকটে আছে, এর যদি অন্নবস্ত্রের ক্লেশ হয়, তবে যে ধর্ম্ম যাবে।

রা। আচ্ছা, টাকা হ'লে আমি ওর পোষাক কিনে দিতে পারি।

গু। এই লও, ছয় টাকা। ছোকরার পোষাক কিনে দেওগে। যখন এর ধুতি, চাদর, জুতা, জামা, ছাতা প্রভৃতির দরকার হবে, তখন আমার নিকট হইতে টাকা নে কিনে দিও।

রাধিকাবাবু ছয় টাকা লইয়া মধুর ধুতি, উড়ানী, জুতা, জামা ও ছাতা ক্রয় করিয়া দিলেন। মধু সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া রাধিকাবাবুর অনুগমন করিল। মধুকে সঙ্গে লইয়া রাধিকাবাবু শ্বশুরবাটীতে উপনীত হইলেন। ভ্রাতা-ভগ্নীতে পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ হইল। পরস্পরের সুখ-দুঃখের কথা হইল। আবার স্নেহময় ভ্রাতাভগ্নীর মিলনে পরস্পরের মুখকান্তি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মধুর আয় ব্যয়।

ঈশ্বর দাতা। তিনি বিশ্বভাণ্ডার লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি যখন দান করেন, তখন প্রার্থী আশাতিরিক্ত অর্থ লাভ করে। তিনি যখন বিমুখ হইয়া বসিয়া থাকেন, তখন প্রার্থী সহস্র যত্ন-চেষ্টা করিয়াও কিছুমাত্র অর্থ লাভ করিতে পারে না। যেমন তাসখেলার পড়তা আছে, পাশাখেলার পড়তা আছে, উপার্জ্জনেরও সেইরূপ পড়তা আছে। উপকথায় উড়ে রাজার ধনের কথা শুনিয়াছ। যখন সুসময় হয়, ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন, তখন দশ দিক হইতে অর্থ আসিয়া পড়িতে থাকে। তখন বাঁশের কুলা বাহির করিলে সোণার কুলা হয়। রৌপ্যের থালা বাহির করিলে সুবর্ণের থালা হয়। পিত্তল কাঁসার বাসন রৌপ্যের বাসন হইয়া উঠে। বাস্তবিক মনুষ্যের ভাগ্যে সময়ে সময়ে এইরূপ সুসময় হইয়া থাকে।

নির্ম্মলা রাধিকা বাবুর শ্বশুরবাটীতে থাকিল। দশ-পনর দিন অতীত হইতে না হইতেই নির্ম্মলার প্রতি গৃহিণীর বিশেষ দয়া মায়া হইয়া উঠিল। তিনি কর্ত্তার সহিত ঝগড়া করিয়া নির্ম্মলাকে ঝিদিগের পুরা বেতন (মাসিক দুই টাকা হিসাবে) দিতে লাগিলেন। গৃহিণীর বিশেষ চেষ্টা থাকিল, যাহাতে নির্ম্মলা মাসিক কিছু উপরি পায়। যেখানে যে তত্ত্ব লইয়া যাহাতে হইত এবং যে তত্ত্বে কিছু পাইবার আশা থাকিত, সেই তত্ত্ব লইয়াই নির্ম্মলা প্রেরিত হইতে লাগিল। দুগ্ধ যোগানের হিসাব নির্ম্মলা করিত ডাইল যোগানদারের হিসাব নির্ম্মলা রাখিত। মাস অন্তে নির্ম্মলাই হিসাব করিত; এবং যদি কিছু হিসাব আনা প্রাপ্য হইত, তাহাও নির্ম্মলা পাইত।

নির্ম্মলা স্বল্প দিনের মধ্যে সূচীকার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণতা দেখাইল। সে অল্পদিনের মধ্যে কর্ত্তার প্রয়োজনীয় রুমাল, কম্ফর্টার, ষ্টকিং, জুতা, জেরদাজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিল। সে গৃহিণীর পুত্র কন্যাদিগের জুতা, মোজা, কম্ফর্টার, রুমাল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিল। রাধিকার শ্বশুরবাটীতে উলের ও সূচের অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইল। কিছুদিন পরেই নির্ম্মলা গৃহকার্য্য সারিয়া অন্যান্য অনেক শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে লাগিল ও গৃহিণীর দালালিতে সেগুলি অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহার প্রস্তুত টুপী ও রুমাল সুখ্যাতির সহিত বিক্রীত হইতে লাগিল। বেতন, তত্ত্বের পাওনায় এবং শিল্পকার্য্যে নির্ম্মলা মাসিক পাঁচ ছয় টাকা আয় করিতে লাগিল। যেখান হইতে যে কুটম্ব আসিতে লাগিলেন, তাঁহারাও নির্ম্মলার কারু-কার্য্যময় দ্রব্য উপহার পাইয়া, তাহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিতে লাগিলেন।

হৌসে মধু তামাকু সাজিতে লাগিল সে সন্তুষ্টচিত্তে সযত্নে সকল বাবুকে তামাকু খাওয়াইতে লাগিল। সে সকল বাবুদিগেরই ফাই ফরমাইস শুনিতে লাগিল। পূর্ব্বের চাকরেরা মুচ্ছদ্দি বাবুর ধূমপান-গৃহে কেরাণী বাবুদিগকে উকি মারিতেও দিত না। তাহারা যাঁহার ভৃত্য ছিল, তাঁহারই কার্য্য করিত। মধু যাঁহার ভৃত্য, তাঁহার কার্য্য করিয়াও সকলের মনস্তুষ্টির প্রয়াস পাইত।

পূর্ব্বে হৌসের কেরাণী বাবুরা জলখাবারওয়ালার নিকটে জলখাবার খাইয়া টিপিনের সময় কেবল ধূমপান করিতে পাইতেন। অনেক অল্প বেতনের কেরাণী কেবল ধূমপানের জন্য বাধ্য হইয়া জলখাবার কিনিয়া খাইতেন। জলখাবারওয়ালার অনেক পচা বাশী মিঠাই সন্দেশ বিক্রয় হইয়া যাইত মধুর সময়ে তাঁহারা ইচ্ছামত জলখাবার খাইতেন। তাঁহারা দোকান হইতে মধুকে দিয়া জলখাবার কিনিয়া আনাইয়া খাইতেন। কেহ বা মধুকে দিয়া ফল ফুলারি আনাইয়া খাইতেন। মধুর বাচনিক মধুর দুরবস্থার কথা তাঁহারা জানিয়াছিলেন। মধুর সুব্যবহারে তাঁহারা তাহার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া জলখাবার ক্রয় করিয়া না খাওয়ায়, কেরাণী বাবুদিগের পয়সারও সাশ্রয় হইয়াছিল। মাসান্তে তাঁহারা পরামর্শ করিলেন, গরীব মধুকে তাঁহারা স্ব স্ব বেতন অনুসারে এক আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত দিবেন। এইরূপে কেরাণী বাবুদিগের নিকট হইতে মধুর মাসিক আয় ছয় সাত টাকা হইল। কেরাণী বাবুগণ যে দিন বেতন পাইতেন, সেই দিনই কিছু কিছু করিয়া মধুকে দিতেন।

বৃদ্ধ গুরুদাস বাবুও কার্য্যানুসারে বেতন দিতেন। তাঁহার বয়সের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব হৌসের চাকরেরা হৌসে তামাকু

সাজিত, সেজন্য তিন টাকা বেতন পাইত এবং গুরুদাস বাবুর বাটীতে সামান্য সামান্য কাজ করিত ও তথায় আহার পাইত; কিন্তু পূর্ব্ব চাকরেরা হৌসের তামাক সাজিয়া বাটির কার্য্য করিতে বড় রাজী হইত না। মধু সমানভাবে দুই স্থানের কার্য্য করিত, মধুর কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ ছিল না। সে সকল কার্য্যই করিত, আবার কোন কার্য্যই করিত না। সে সকল কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেও রাধিকা বাবুদের বাটীর সকলে তাহার প্রতি দয়া করিয়া ও তাহার সুব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া, প্রায় তাহাকে কোন কার্য্যই করিতে দিতেন না। সে কর্ত্তা গৃহিণী ও ছেলে বাবুদিগের সখের দ্রব্য কিনিত ও গোপনীয় বিশ্বাসের কার্য্য করিত। গুরুদাস বাবু মধুর কার্য্যে সুখী হইয়া ও কেরাণী বাবুদিগের অনুরোধে পড়িয়া, তাহাকে পুরাবেতন তিন টাকাই দিতে লাগিলেন।

নির্ম্মলা ও মধুব বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে হইত না। কোন আহারের বা ব্যবহারের দ্রব্য নিজের অর্থে ক্রয় করিতে হইত না। তাহারা যে যে বাটীতে থাকিত, সেই সেই বাটীর বালক বালিকার ন্যায় প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই পাইত। কর্ত্তা গৃহিণীরা তাহাদিগকে আপন আপন সন্তা-নের ন্যায় জ্ঞান করিতেন।

তুমি আপন আর পর কাহাকে বল? তুমি কেবল এক বংশের এক শোণিত হইতে উৎপন্ন লোকদিগকে কি আপন বলিতে চাহ? আমি বলি, তাহা নহে। সংসারের সকলেই আপন, সকলেই পর। আপনপর লোকের চরিত্র ও গুণে; পরের চরিত্র ভাল হইলে, গুণ থাকিলে, পরই আপন। চরিত্র মন্দ হইলে, গুণ না থাকিলে. আপনও পর।

চরিত্র বড় মহৎ দ্রব্য। চরিত্রে মানুষকে দেবতা করে। নির্ধন, নিঃসহায়, সাধু চরিত্রবলে সহস্র সহস্র হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিতেছেন। অস্ত্রে শস্ত্রে যাহা করিতে পারে না, ধনৈশ্বর্য্যে যাহা হয় না, বল বিক্রমের যাহা সাধ্য নহে চরিত্র তাহা অনায়াসে করিয়া দিতে পারে। সন্ন্যাসী রাম সচ্চরিত্রবলে বানরের রাজা, চরিত্রবলে নররূপী নারায়ণের অবতার। কৃষ্ণ চরিত্রবলে ভুবনবিজয়ী কুরু-পাণ্ডবের উপাস্যদেবতা ও জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মের মতে জগতের সর্ব্বপ্রধান বরণীয় অর্ঘ্যপাত্র। চরিত্র বড় মহাধন। গুণ বড় অমূল্য রত্ন। মানব, যদি তুমি সংসার রাজ্যে নর-হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতে চাও, তবে চরিত্রবান হও।

কোথাকার বর্দ্ধমান জেলার দীন বালক-বালিকা সামান্য গুণে সামান্য অগঠিত নির্দ্দোষ চরিত্র লইয়া দুই ধনী ব্রাহ্মণপরিবারের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে।

নির্ম্মলা ও মধু প্রথম প্রথম বাটীতে মায়ের নিকট দশ টাকা করিয়া খরচ পাঠাইয়া দিত। যে সময়ের কথা কথিত হইতেছে, সে সময়ে পাঁচ টাকার নোট ছিল না ও মণিঅর্ডারের প্রথা হয় নাই। তখন রেজিষ্ট্রেশান ফি অধিক ছিল এবং দশ টাকার কম মূল্যের নোট ছিল না। তখন, ইচ্ছা করিলে, দুই চারি টাকা পাঠান যাইত না। পরে যখন বালক বালিকা জানিল, মাসিক পাঁচ টাকা হইলে তাহাদের মাতার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, তখন তাহারা প্রত্যেক দুই মাসে দশ টাকা করিয়া বাড়ী পাঠাইত। মাতার খরচ দিয়া প্রতি মাসে তাহাদের যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইত, তাহা নির্ম্মলার নিকট থাকিত। সে অর্থ নির্ম্মলা গৃহিণীর যোগে গহনা বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ দিত। এইরূপে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ সুদসহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অন্য দিকে মহামায়া যখন পুত্রকন্যাগণের নিকট প্রতিমাসে কিছু কিছু স্থায়িরূপে অর্থ পাইতে লাগিলেন, তখন তিনি স্থায়িরূপে মুখোপাধ্যায় বাটীতে পরিচারিকার কার্য্য ত্যাগ করিলেন; তিনি মধ্যে মধ্যে মুখোপাধ্যায় বাটীতে কার্য্য করিয়া তথায় আহার করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বাটীতে থাকিতেন। মুখোপাধ্যায়ের গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেই তিনি তথায় গমন করিতেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে পুত্র কন্যার প্রেরিত অর্থ দ্বারা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৩৫।৶০ ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

মহামায়াও বিলক্ষণ হিসাবী ও পরিমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি প্রতিমাসে প্রেরিত পাঁচ টাকা আয় হইতে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কিছু কিছু উদ্বৃত্ত করিতে লাগিলেন। তিনি গাভী বিক্রয় করিয়া রামধনের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন; এক্ষণে পুনরায় সবৎসা গাভী ক্রয় করিলেন। তিনি পুনরায় বাটীর গর্ত্তটি সুগভীর করিয়া কর্ত্তন করাইয়া তাহাতে মৎস্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ফুলের বাগান ও তরকারীর বাগান পুনরায় সুন্দর ও সজ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় গৃহগুলির সংস্কার করাইলেন। মহামায়ার হাতেও অনেক সময় দুই চারি টাকা থাকিতে লাগিল।

মহামায়াও তরকারী, দুগ্ধ, ঘুঁটা, ঘৃত ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু আয় করিতে লাগিলেন। তিনি অপক্ব পতিত আম্র হইতে আমচুর করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন; পক্ব আম্র হইতে আমসত্ব প্রস্তুত করিয়া অসময়ে বিক্রয় করিয়া দুই পয়সা আয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার নারিকেল পত্র হইতে প্রস্তুত ঝাঁটার শলা বিক্রীত হইতে লাগিল। তাঁহার গৃহের পুরাতন গুড়, পুরাতন ঘৃত, পুরাতন তেঁতুল, পুরাতন পক্ব কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বহুমূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রস্তুত কাঁথা,

সিকা, চুলের দড়ি, চুলের ফুল গ্রামের সকলেই আদর করিয়া ক্রয় করিতে লাগিল। মহামায়া পরিচারিকার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ও বাটিতে থাকিয়া অবকাশ কালে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া এইরূপে আয় করিতে লাগিলেন। মহামায়ার অবস্থান্তর দেখিয়া অনেকেই সুখী হইলেন।
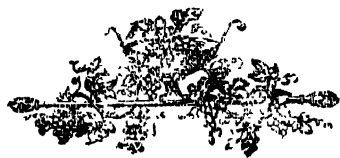
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মধুর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা।

পাঠক! তুমি কি বলিতে চাহ, বিদ্যাশিক্ষা ধন, অবসর ও অভিভাবক সাপেক্ষ? আমি বলি, তাহা নহে। আমি বলি, বিদ্যাশিক্ষা কেবল শিক্ষার্থীর আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা সাপেক্ষ। ভূমণ্ডলে পূর্ব্বকালে যত পণ্ডিত শিরোমণি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই লক্ষ্মীর বরপুত্র ছিলেন না। কেহ গো মহিষাদি পশুচারণ করিতে করিতে বৃক্ষমূলের শ্যামল তৃণাসনে উপবেশন পূর্ব্বক, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে ডাকভার বহন পূর্ব্বক, কেহ তেঁতুল পত্রের অম্ল ও অপকৃষ্ট তণ্ডুলের অন্নে কেহ অর্দ্ধাশনে, কেহ বা অল্পাশনে পরিতৃপ্ত থাকিয়া, বিদ্যামন্দিরের উচ্চাসনে সম্ভ্রান্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইয়ুরোপীয় আদি ও সর্ব্বপ্রধান কবি হোমর অন্ধ অবস্থায় ইলিয়ড গ্রন্থের কবিতা রচনা ও গান করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। মহাকবি কালিদাস, 'গৃহে তণ্ডুল নাই' এই কথা

প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণের অনুরোধক্রমে মাতৃমুখে শ্রবণ করিয়া, দুশ্চিন্তায় বিচারে পরাভূত হইয়াছিলেন। বঙ্গের পণ্ডিত চূড়ামণি, ন্যায়ের চিন্তামণি টীকা প্রণেতা, রঘুনাথ শিরোমণি তেঁতুল পত্রের অম্ল ও মোটা তণ্ডুলের অন্ন আহার করিয়া এবং সহধর্ম্মিণীকে আয়তীর চিহ্নস্বরূপ করে রক্তসূত্র পরাইয়া সন্তুষ্ট থাকিয়া, অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা সময়সাপেক্ষ নহে। শিক্ষা কেবল মনোযোগ ও প্রণালী বা পদ্ধতি সাপেক্ষ। যেই মনোযোগরূপ ইন্ধন সংগ্রহ হইল ও তাহাতে যত্নরূপ ফুৎকারোদ্দীপ্ত পদ্ধতি হুতাশন সংযোগ করা হইল, অমনি শিক্ষার অশন আপনা আপনি পাক করা হইবে। যদি চলিবার ইচ্ছা থাকে, আর পান্থ সুন্দর সুপরিষ্কৃত পথ প্রাপ্ত হয়, তবে আর তাহার গমনের বাধা কি? আমি এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে প্রতিপন্ন করিব যে শিক্ষা কেবল শিক্ষার্থীর আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টাসাপেক্ষ। আমার অর্থ নাই, অবসর নাই, আমার অভিভাবক নাই, আমার শিরে সংসারের গুরুভার, আমার শিরে কর্ত্তব্যের গুরুভার ইত্যাদি কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যাঁহারা বিদ্যা-শিক্ষা করিতে পারিলেন না বলেন, তাঁহারা কখন শিক্ষার জন্য প্রকৃত যত্ন করেন নাই। শিক্ষা করিবার অবসর অল্পাধিক পরিমাণে সকল লোকেরই আছে। এই উপন্যাস পাঠে যদি একজন লোকও শিক্ষার পথে ধাবিত হন, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল হইবে, লেখনী ধারণ করাও সার্থক হইবে।

পদ্য গ্রন্থে গ্রন্থকারের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর উদ্বোধন করার প্রথা আছে। গদ্য গ্রন্থে এ প্রথার প্রচলন অতি বিরল। মহাকবি অন্ধ হোমর ও মিল্টন এবং অর্থ-নীতিশাস্ত্রজ্ঞ অন্ধ ফসেটের নামের সহিত মাদৃশ জনের অন্ধত্বের উল্লেখও স্পর্দ্ধার বিষয়। তবে এই সকল অন্ধ মনীষিগণের

অন্ধাবস্থার কার্য্য দেখিয়া মাদৃশ অন্ধের কার্য্য করিবার সাহস লজ্জার বিষয় নহে। হোমরের ন্যায় ক্ষুধানলে জ্বলিয়া কবিতা গান করিয়া ভিক্ষা করিবার অনুকরণে গদ্য উপন্যাস দিয়া ভিক্ষা করাও লজ্জার বিষয় নহে। যাহারা চিন্তা করেন, নিজ শক্তিতেই কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহাদের দৈবশক্তির প্রয়োজন নাই। যাহার বিশ্বাস যে, সে নিজে অন্ধ, অপদার্থ, তাহারই দৈব শক্তির প্রয়োজন; সেই মূঢ়মতি অন্ধ, শিক্ষার পরমারাধ্যা দেবী ও পথ-প্রদর্শক মনীষিগণের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছে, সে যেন এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের জন্য শিক্ষিত সমাজে উপহসিত না হয়, তাহার উপন্যাস যেন সর্ব্বত্র সাদরে পঠিত হয় এবং তাহার উপন্যাস গৌড়জনের নিরবধি পানের সুধাময় মধুচক্র না হইলেও যেন গৌড়ের শিক্ষার্থিগণের নিরবধি আনন্দে পানের সুধাচক্র হয়।

মধু হৌসে তামাক সাজিত, আর কেরাণী বাবুদের নিকট অধ্যয়ন করিত। সে সেই তামাক সাজিবার ঘরের মেজেয় জল দিয়া টিকা দিয়া লিখিত। সে যখন গৃহে আসিত, তখন বাটীর শিক্ষার্থী বালক-বালিকা-দিগের নিকট শিক্ষালাভ করিত। এইভাবে শিক্ষা করিতে করিতে যখন তাহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত হইল, তখন সে হৌসে এক প্রস্থ ও বাটীতে এক প্রস্থ দোয়াত, কলম, কাগজ, শ্লেট, পেন্সিল রাখিল। যখন বোধোদয়, ধারাপাত প্রভৃতি বহি সে ক্রয় করিল, তখন সে সর্ব্বদাই সেই বহিগুলি সঙ্গে রাখিতে লাগিল। সে দুই স্থানেই লিখিত, পড়িত ও অঙ্ক কসিত। তাহার যাহা জানিবার ইচ্ছা হইত, তাহা সে যাহার তাহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিত। এইরূপে সে অধ্যয়ন করিতে করিতে তাহার বাটী হইতে আসার তৃতীয়

বর্ষের শেষভাগে মধ্য-বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক পাঠ সমাপন করিল।

সে শুনিল, মধ্য-বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি নামে একটী পরীক্ষা আছে। এই পরীক্ষায় সকলেই উপস্থিত হইতে পারে, স্কুলের ছাত্রই হউক, আর বাটী-তেই শিক্ষিত হউক, যে কেহ এই পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে। এ পরীক্ষায় পাশ হইলে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি ডাক্তারী, মোক্তারী প্রভৃতি পরীক্ষা দিতে পারে। এই কথা শুনিয়া সে মধ্য-বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকের তালিকা সংগ্রহ করিল, তালিকা অনুযায়ী পুস্তক ক্রয় করিল; রাধিকা বাবুদিগের গৃহশিক্ষককে ধরিয়া পরীক্ষার ফি দাখিল করিল। সে যথাসময়ে উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হইয়া ১২৭৬ সালের মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উপস্থিত হইল।

পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই মধু ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে যেরূপভাবে বাঙ্গালা অধ্যয়ন করিয়াছিল, ইংরাজীও সেই প্রণালীতে পড়িতে আরম্ভ করিল। ইংরাজী পুস্তক সকল সময়েই তাহার সঙ্গে থাকিত, ইংরাজী লেখার উপকরণও তাহার হৌসে ও বাটীতে দুই প্রস্থ থাকিত। তাহার হাতের লেখা হৌসে কেরাণী বাবুরা এবং গৃহে রাধিকা বাবুদের গৃহশিক্ষক সংশোধন করিয়া দিতেন। তাহার ইংরাজী শিক্ষার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল হৌসে কেরাণী বাবুদের নিকট ও বাটীতে রাধিকা বাবুদের গৃহশিক্ষকের নিকট জানিয়া লইতে পারিত।

মধুর বাঙ্গালা হস্তাক্ষর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পূর্ব্বেই সুন্দর ও সুপক্ক হইয়াছিল। একদিন গুরুদাস বাবু তাহার হাতের লেখা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তুই দেখছি, আমার গুরু মহাশয়ের মত লিখিস্।" গুরু-

দাস বাবু তাহার লেখা দেখিয়া তুষ্ট হইয়া তাহাকে পাঁচ দিস্তা কাগজ পুরস্কার দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের মত তখন কাগজ এত সুলভ ছিল না, এবং ভাল কাগজ সর্ব্বত্র পাওয়া যাইত না। সে সময়ের শ্রীরামপুরে মিসনারীদিগের কলে শ্রীরামপুরের কাগজ বলিয়া একরূপ কাগজ প্রস্তুত হইত। সেই কাগজই দেশীয় লোকের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাগজ ছিল। সে কাগজ এখনকার বটতলার রামায়ণ মহাভারতের কাগজের ন্যায়। সে কাগজ এখনও প্রস্তুত হয়; কিন্তু তাহা বালী-মিলের কাগজ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। গুরুদাস বাবু মধুকে যে কাগজ দিয়াছিলেন, সে বিলাতী ভাল কাগজ ও তাঁহার নিজ ব্যবহারের জন্য তিনি হৌসে পাইতেন।

এই সময় হইতে বাঙ্গালা চিঠিপত্র লিখিতে হইলে গুরুদাস বাবু মধুকে দিয়া লেখাইতেন। হৌসে মধুর বাঙ্গালা লেখার সুখ্যাতি ছিল, কেরাণী বাবুরা স্ত্রী, শ্যালিকা প্রভৃতির নিকট সুন্দর স্পষ্টাক্ষরে পত্র লিখিতে হইলে, মধুকে দিয়া লেখাইতেন। রাধিকা বাবুদিগের বাটীর বধূ ও কন্যাগণের প্রয়োজনীয় সকল পত্রই মধু লিখিয়া দিত। ইহাতে মধুর স্ত্রীমহলে একটু আদর ছিল।

নির্ম্মলার আদেশ ও ইচ্ছানুসারে মধু ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে মধুর পরীক্ষা দিবার বড় ইচ্ছা ছিল না। নির্ম্মলা তাহাকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছিল যে, লেখা পড়া শিখিলেও, পরীক্ষা না দিলে বুঝা যায় না কতদূর লেখা পড়া শিক্ষা হইল। পাসের আদর বড় অধিক। এই সময়ে বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাসও একটা পাস মধ্যে গণ্য ছিল। এখন যেমন লোকে চারি পাস চায়, এণ্ট্রান্স, এল-এ বিএ, এম-এ, তখন লোকে দুই পাসেই তুষ্ট হইত। তখনকার দুই

পাস, বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি আর এণ্ট্রান্স। তখনকার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষো-ত্তীর্ণ ব্যক্তি কৃতবিদ্য মধ্যে গণ্য ছিলেন। এই সময়ে এণ্ট্রান্স পাস ব্যক্তি পণ্ডিত বলিয়া আদৃত হইতেন। নির্ম্মলার কথা অনুসারে মধুর পরীক্ষা দিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে।

পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য মধু ও নির্ম্মলা সমান উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। তখন ছাত্রবৃত্তি ও মধ্য-ইংরাজী পরীক্ষা একটা বেওয়ারেশ মাল ছিল। পরীক্ষার সুশৃঙ্খলতা আদৌ ছিল না। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল না। পরীক্ষা কথন ভাদ্র, কখনও অগ্রহায়ণ মাসে হইত; আর পরীক্ষার ফল পাঁচ ছয় মাস পরে এডুকেশন গেজেটের অঙ্গে প্রকাশ পাইত। নির্ম্মলা ও মধু পরীক্ষার ফলের উৎকণ্ঠায় কত দেব-দেবীর নিকট মাথা কুটিতে লাগিল। তাহারা কত শুভাশুভ স্বপ্নই দেখিতে লাগিল।

পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষা-মন্দিরে কয়েকটা পরীক্ষার্থী স্কুলের ছাত্রের সহিত মধুর আলাপ হইয়াছিল। সেই ছাত্রগণের সহিত মধুর মধ্যে মধ্যে দেখা হইত; সে তাহাদের নিকট পরীক্ষার ফলের কথা জিজ্ঞাসা করিত, সেই ছাত্রগণ পরীক্ষার ফল কত দিনে বাহির হইবে—কোন কাগজে বাহির হইবে ইত্যাদি সংবাদ বলিয়া দিত। তাহারা কলি-কাতার মধ্যে যে যে স্থানে এডুকেশন গেজেট আসিত, তাহাও মধুকে বলিয়াছিল। পরীক্ষার দুই মাস পর হইতে মধু প্রতি সপ্তাহের এডুকেশন গেজেট দেখিতে যাইত।

ঈশ্বর কল্পতরু। আন্তরিক যত্নের সহিত কার্য্য করিয়া একান্ত মনে তাঁহার নিকট যে অভীষ্ট সিদ্ধির প্রার্থনা করা যায়, তাহা তিনি সিদ্ধ করেন। পাঠক! মনে করিয়া দেখ, জীবনে যে কার্য্যের জন্ম ভয়ে

ভয়ে হৃৎকম্পের সহিত একান্তমনে ঈশ্বরকে ডাকিয়াছ, তাহার এক-টীতেও বিফলমনোরথ হও নাই! চৈত্র মাসে মধ্যবাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল বাহির হইল। মধু সংবাদপত্রে মুদ্রিত অক্ষরে দ্বিতীয় বিভাগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে নিজের নাম দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইল। সে কৃতজ্ঞচিত্তে দেবগণের চরণে প্রণিপাত করিল।

মধু রাধিকা বাবুর বাটীর সকলকে ও দিদি নির্ম্মলাকে পরীক্ষার সংবাদ জানাইল। ভ্রাতা ও ভগিনী পরস্পরের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া পরস্পর কত সুখী হইল। ভ্রাতা ও ভগিনী কৃতজ্ঞচিত্তে উপবাসী থাকিয়া যথাসাধ্য উপচারে সত্যনারায়ণের পূজা করিল। বাটীতে মাতার নিকট পরীক্ষার সংবাদ পত্রে লিখিয়া জানাইল। মাতাও এই সংবাদে যার পর নাই সুখী হইয়া সত্যনারায়ণ পূজা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—◇◇—

নির্ম্মলার মিথ্যাপবাদ।

হিংসা! তোমার চরণে কোটী প্রণাম করি। নরসমাজে তোমার কর্ত্তৃত্ব কম নহে। তুমিও অলক্ষিতভাবে, অতর্কিতভাবে, অচিন্তিত মূর্ত্তিতে নর-সমাজে বিরাজ করিয়া কত অনর্থ ঘটাইতেছ। মনুষ্য দয়া মমতার বশবর্ত্তী হইয়া তদপেক্ষা হীনাবস্থার লোককে দয়া করিয়া থাকে, সমকক্ষ লোকদিগকে অনেক সময়ে বন্ধুভাবে দেখিয়া থাকে; কিন্তু যাহার অবস্থা একটু ভাল, তাহার হিংসা করিয়া থাকে। আবার অবস্থা অত্যুন্নত করিতে পারিলে—তাহাদিগের সমকক্ষতার সীমা হইতে অধিকতর উচ্চে আসন লইতে পারিলে,—লোকে পদানত হইয়া তোমাদের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ করে। প্রতি গ্রামেই লোকের প্রকৃতি এইরূপ দেখিবে।

মহামায়ার অবস্থা যতদিন হীন ছিল, ততদিন অনেকেই তাঁহাকে দয়া মায়া করিত। তাঁহার অবস্থা যখন সামান্য ভাল হইল, অর্থাৎ তিনি কাহারও কিছু ধারেনও না, তাঁহার নিকটও কেহ ধারে না, এইরূপ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, তখনও তাঁহার কেহ হিংসা করিত না। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রটী যখন গ্রামের অপর বালকদিগের সহিত ভাল জুতা, জামা, উড়ানি, ধুতি পরিয়া চকদাঘি স্কুলে পড়িতে যাইতে লাগিল, কনিষ্ঠ পুত্রটী গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করিল, তিনি নিজেও সামান্য ধোলাই কাপড় পরিতে লাগিলেন ও দুইচারি টাকা কর্জ্জ দিতে লাগিলেন, তখন অনেকেই তাহার হিংসা করিতে লাগিল।

এক দিন একজন প্রতিবেশী মহামায়ার নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে আসিল। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার হাতে টাকা না থাকায় তিনি ঋণ দিতে অসমর্থা হইলেন। সে মনে মনে রুষ্ট হইল। এবং স্বকীয় অদ্ভুত কল্পনা-শক্তির বলে অপর প্রতিবেশীর নিকট প্রকাশ করিল, "মহা-মায়ার কন্যা নির্ম্মলা এক্ষণে নবীনা ষোড়শী যুবতী। তাহার রূপলাবণ্য অসাধারণ। সে কলিকাতার কোন ঘৃণিত স্থানের এক দ্বিতল গৃহের দুইটি কুঠরি ভাড়া লইয়াছে। তাহার আয় খুব, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

অপর প্রতিবেশী আর তিনজনকে কহিলেন। বলা বাহুল্য ইনিও মহামায়ার হিংসা করিতেন। সেই তিন জন আর নয়জনকে কহিল। সেই নয়জন আর সাতাশ জনকে বলিল। এইরূপে পাঁচ দিনের মধ্যে এই অপবাদটী গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতার কর্ণগোচর হইল। পরিশেষে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে অপবাদ আসিয়া মহামায়ার কর্ণেও উঠিল। মহামায়া এই কথা শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিতা ও ভীতা হইলেন। তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরীকরণে অসমর্থা হইয়া, অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আসি-

লেন। অম্বিকাবাবু, হলধর মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে এফ এ, পড়িতেছেন। ইনি মধ্যে মধ্যে নির্ম্মলা ও মধুকে দেখিতেন। মহামায়া তাঁহার নিকট আসিয়া, নির্ম্মলার যে অপবাদের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন, ঠাকুরপো! এখন উপায় করি কি? এ অপবাদ কিসে যায়? নির্ম্মলার বিবাহের কি উপায় করি?

অম্বিকা বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি বাড়ী আসার দিনও তাকে দেখে এসেছি। তাকে এখনও এগার বৎসরের অধিক-বয়স্কা দেখায় না, বর মধুকে তের চোদ্দ বৎসরের দেখায়। দুষ্টলোকে কত কথা বলে, তার আর উপায় নাই। তবে ইচ্ছা কর নির্ম্মলাকে বাড়ী এনে বে দিতে পার।"

মহামায়া। তবে আপনি পত্রে বাড়ী আসতে লিখে দিউন। নির্ম্মলা বাড়ী আসুক, আমি তার বে দিই।

এই কথোপকথনের পর অম্বিকা বাবু মধুর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহা এই;—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

জাড়গ্রাম,
১৩।২।১২৭৭

চিরজীবেষু—

বাপ মধু, তোমার পত্র ও টাকা পাইয়াছি। দেশের দুষ্ট লোকে নির্ম্মলা সম্বন্ধে যে অপবাদ করিতেছে, তাহাতে আমার গলায় দড়ি দিয়া

ম'রতে ইচ্ছা করে। নির্ম্মলার শীঘ্র বিবাহ দেওয়া উচিত। তোমরা পত্র পাঠ বাটী আসিবা। আমরা ভাল আছি ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা।

শ্রী - তোমার মাতা।

এই পত্র পাইয়া মধু নির্ম্মলাকে পড়িয়া শুনাইল। পত্র শুনিয়া নির্ম্মলা বলিল,—"এখন আমাদের বাড়ী যাওয়া হবে না। এই পত্রের উত্তর যাহা দিতে হয়, তাহা গৃহিণীর নিকট শুনিয়া কল্য দিবে।" মধু উক্ত পত্রের উত্তর যাহা লিখিয়াছিল তাহা এই ;—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

কলিকাতা,

১৯।২।৭৭।

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি। দিদিকে পত্র পড়িয়া শুনাইয়াছি। আমাদের এক্ষণে বাটী যাওয়া হইবে না। গ্রীষ্মের ছুটির শেষে অম্বিকা কাকা যখন কলিকাতা আসেন, তখন আপনিও গ্রামের দুই তিনটি স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিবেন। তাঁহাদিগের যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া আমি দিব। আমরা ভাল আছি। নিবেদন ইতি।

সেবক শ্রীমধুসূদন দত্ত।

এই পত্র লেখার কিছুদিন পরে মহামায়া ও আর তিনটী স্ত্রীলোক কলিকাতায় গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রাধিকা বাবুর শ্বশুর বাটীতে ছিলেন ও নির্ম্মলাকে দেখিয়াছিলেন। মধু তাঁহাদিগকে যাতায়াতের গাড়িভাড়া, এক এক খণ্ড নূতন বস্ত্র ও এক এক

টাকা বাজার-খরচ দিয়াছিলেন। এই স্ত্রীলোকেরা বাটীতে যাইয়া প্রকাশ করিলেন, নির্ম্মলার বয়স নয় বৎসরের একচুল বেশী নহে। সে এক ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-কন্যা হইয়াছে। সে সর্ব্বদা দোমহলার উপর থাকে। তাহার মুখচন্দ্র, সূর্য্য ও দেখিতে পান না। তাহার কত যত্ন, কত আদর।

এই কথায় নির্ম্মলার অপবাদ জলচিত্রবৎ অল্প সময়ের মধ্যে বিদূরিত হইয়া গেল। মিথ্যার ক্ষণিক রাজ্য অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লয় পাইল। হিংসার মায়াজাল প্রকৃত মায়াজালই প্রতিপন্ন হইল। হিংসাদি নরের রিপুদল! তোমরা এইরূপ নরসমাজে কত কলঙ্ক উঠাইতেছ, কত অহিত সংসাধন করিতেছ। তোমাদের মিথ্যা মায়াজালের ঘোর অন্ধকারে কত হতভাগ্য নর আত্মঘাতী ও কত হতভাগ্য নারী আত্ম-ঘাতিনী হইতেছে। কালে তোমাদের মায়াজাল অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু সেই কালের অপেক্ষায় চঞ্চল প্রকৃতি মানবের কয়জন কত দিন ধৈর্য্য ধরিতে পারে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মধুর দোকানদারী।

গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতপ্রবর সোলন কোন সময়ে লিডিয়া দেশাধিপতি ক্রীসসের অতিথি হইয়াছিলেন। ধনগর্ব্বী ক্রীসস্ সোলনকে নিজ সম্পদ দেখাইয়া, "জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী কে?" এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সোলন অপরাপর সুখী ব্যক্তিগণের নাম করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রীসসের নাম করেন নাই। লিডিয়ারাজ তাহাতে চমৎকৃত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। 'লোক জীবিত থাকিতে তাহাকে সুখী বলা যায় না', সোলন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে পারস্যরাজ ক্যামবাইসিস্ ক্রীসস্কে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া গৃহে লইয়া যান এবং তাঁহাকে জলন্ত হুতাশনে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দেন। ক্রীসস্ অগ্নিসম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে "সোলন", "সোলন" বলিয়াছিলেন। পারস্যরাজ "সোলন শব্দ উচ্চারণের তাৎপর্য্য কি?" জিজ্ঞাসা করিয়া,

সোলন ক্রীসসের মধ্যের ঘটনা অবগত হইয়াছিলেন। পারস্যাধিপতি সেই ব্যাপার অবগত হইয়া ক্রীসস্‌কে অগ্নিতে আর নিক্ষেপ করিলেন না। তিনি লিডিয়ারাজের সহিত বন্ধুতা করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। পাঠক! দেখ, স্বাধীন রাজাদিগের কিরূপ ভাগ্য-বিপ্লব—কিরূপ অবস্থা বিপর্য্যয়! তোমার আমার পক্ষে যে কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা বর্ণনাতীত। মধু সামান্য ভৃত্য, তাহার ভাগ্যও সামান্যরূপ পরিবর্ত্তনশীল। অদ্য মধু ভৃত্য আছে, কল্য মধু বণিক, ব্যবসায়ী, কর্ম্মচারী ইত্যাদি সব হইতে পারে। আবার সে কপর্দ্দকশূন্য ফকির, বন্দী, রাজকারাগৃহবাসী ইত্যাদি সব হইতে পারে। পরিবর্ত্তন ভালর দিকেও যাইতে পারে, মন্দের দিকেও যাইতে পারে। পাপপূর্ণ সংসারে পাপমতি মানবের ভাল পরিবর্ত্তন অল্প। এখন দেখা যাউক, মধুর ভাগ্যে কিরূপ পরিবর্ত্তন আইসে। ১২৭৯ সালের শ্রাবণ মাসের শেষভাগে একদিন অম্বিকা বাবু আসিয়া রাধিকা বাবুর সহিত কি পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা দুজনে বৃদ্ধ গুরুদাস বাবুর নিকট গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা মধুকে তথায় ডাকাইলেন। মধু তাঁহাদের নিকট গমন করিল। অম্বিকাবাবু মধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মধু! হোসে তোমার ইংরাজী পড়া কেমন চলে?

মধু। জিওমেট্রি, এলজেব্‌রা মোটেই পড়া চলে না। ইংরাজীও তত ভাল হয় না।

অম্বিকা। বাড়ীর গৃহ-শিক্ষকের নিকট কিরূপ চলে?

মধু। তিনি পড়া'তে পারেন. কিন্তু সময় নষ্ট ক'রে আমাকে পড়া'তে ইচ্ছা করেন না।

অম্বিকা। আমরা যদি তোমাকে অন্য কোথাও ভাল পড়ার সুবিধা ক'রে দিতে পারি, তুমি তথায় যেতে রা'জি আছ ?

মধু। যদি পড়া চলে আর কিছু কিছু আয় হয়, তবে আমি যেতে পারি।

অম্বিকা। আমাদের কলেজের জলখাবারওয়ালা মরেছে। কলেজের উত্তরে যে রাস্তা, ঐ রাস্তার উত্তরে এক খোলার বাড়ী ক'রে, সে, সেই বাড়ীর মধ্যে সপরিবারে বাস ক'রতো, আর বাহিরের ঘরে জলখাবার বেচতো। তা'র পরিবার আমাকে ব'ল্লে, তা'র ছেলেগুলি ছোট, সে ঐ বাড়ী বে'চে দেশে চ'লে যাবে। ষাট টাকা পেলে সে ঐ বাড়ী বেচে।

মধু। কর্ত্তারা যা বলেন, আমি তাই ক'রতে প্রস্তুত আছি।

অম্বিকা। কর্ত্তা বলেন, তুমি দেখ, তোমার দিদির নিকট কি টাকা আছে। যদি তুমি টাকা দিতে পার ভালই, নচেৎ কর্ত্তাই তোমাকে সেই বাড়ীখানা কিনে দিবেন।

এই কথোপকথনের পরে মধু নির্ম্মলার নিকট হইতে ৪০৲ টাকা আনিল। কর্ত্তা গুরুদাস বাবু আর ৬০৲ টাকা দিলেন। ষাট্ টাকায় সেই জলখাবারওয়ালার বাড়ী মধুর নামে ক্রয় করা হইল। দশ টাকা দিয়া সেই বাড়ী সংস্কার করা হইল। ত্রিশ টাকা মধুর জলখাবার দ্রব্যাদি ক্রয়ের মূলধন হইল।

মধু প্রতিদিন দেড়মণ মিঠাই সন্দেশ কিনিত ও বাকি টাকার ফল ফুলারি আনিত। কলেজের ছাত্রেরা সমুদায় মিঠাই সন্দেশ ক্রয় করিয়া খাইত। মধু সেই বাটীর বাহিরের ঘরে জলখাবার বিক্রয় করিত এবং বাটীর মধ্যের ঘরগুলি ভাড়া দিয়া প্রতিমাসে বার টাকা ভাড়া পাইত। বাড়ীর জমির মাসিক খাজনা ছয় টাকা লাগিত। এইরূপে প্রতিমাসে

মধুর বাড়ী ভাড়া হইতে ছয় টাকা ও জলখাবার বিক্রয়ের কার্য্য হইতে মাসিক ৩৫।১৬ টাকা আয় হইতে লাগিল। স্বভাবগুণে অল্পদিনের মধ্যে মধু কলেজের সকল ছাত্রেরই অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। সে এক ফরাসের উপর এক ছিদ্রবিশিষ্ট বাক্স ও একখানি হিসাবের খাতা রাখিয়া, একমনে অধ্যয়ন করিত এবং ছাত্রগণ স্ব স্ব হস্তে জলখাবার লইয়া খাইয়া, জল পান করিয়া, নগদ পয়সা হইলে বাক্সে ফেলিয়া দিত ও বাকি হইলে হিসাবের খাতায় লিখিয়া রাখিত। ছাত্রগণের পরামর্শে মধু একটী আলমারিতে কাগজ, কলম, দোয়াত, পেন্সিল ইত্যাদিও কিছু কিছু রাখিত এবং তাহাতেও তাহার কিছু কিছু আয় হইত।

কলেজের জলখাবার বিক্রেতা হইয়া মধুর অধ্যয়নের বিশেষ সুবিধা হইল। এই সময়ে সুবিখ্যাত দার্শনিক জারডিন সাহেব এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার নামে জেনারেল এসেমব্লি কলেজে অনেক ভাল ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছিল। মধু এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতে এম্‌-এ ক্লাস পর্য্যন্ত সকল ক্লাসের ছাত্রের সহায়তা পাইত। ইংরাজী সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, রচনা, অনুবাদ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি অধীতব্যবিষয়ে জ্ঞাতব্য ও ভাল ভাল কথা যে ছাত্র যাহা পাইতেন, অগ্রে মধুকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন ও সে বলিতে না পারিলে তাহাকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে মধু মুখে মুখেও অনেক বিষয় শিখিয়াছিল। হৌসে থাকিতেই মধুর বাঙ্গলা হস্তাক্ষর ভাল হইয়াছিল। সে সময়ের কেরাণীদলের মধ্যে হস্তাক্ষরই অনেকের বিদ্যা ছিল। মধু সেই দলের ছাত্র, হৌসেই মধুর ইংরাজী হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হইয়াছিল। মধু ইংরাজী ছাপার অক্ষরও বেশ লিখিতে পারিত। এ সময়ে চিত্র-বিদ্যার প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট না হইলেও দুই একটী কেরাণী সুন্দর

ছবি আঁকিতে পারিতেন। হোসে মধু একটী প্রাচীন কেরাণীর নিকট ছবি-অঙ্কন শিক্ষা করিয়াছিল।

পাঠক! বল দেখি সর্ব্বত্র জয়লাভ করে কে? তুমি অবশ্যই বলিবে রূপসী, রূপবান্ ও চরিত্রবান্। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, রূপ ও চরিত্রের মধ্যে কাহার শক্তি অধিক? তুমি যদি উত্তর দানে ইতস্ততঃ কর, তবে আমি বলি, রূপের জয়—রূপের মোহ—অস্থায়ী, আশু ফলপ্রদ। চরিত্রের জয় স্থায়ী ও ফল চিরসুখকর। কোকিল কাল, দয়েল সুন্দর, ভ্রমর কাল, বোলতা সুন্দর, কুক্কুর কুৎসিত, সিংহ সৌন্দর্য্যবান্! শিশু প্রথমে দয়েল, বোলতা, সিংহকে আদর করে বটে, কিন্তু দয়েলের রব, বোলতার হুল আর সিংহের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়াই পলায়নপর হয়। কোকিল তান ছাড়িলে, ভ্রমর গুন্ গুন্ করিলে, কুক্কুর লাঙ্গুল নাড়িয়া রসনা লেহন করিয়া নিকটে আসিলে, শিশু কোকিল ও ভ্রমরকে গুরু করিয়া তাহাদের স্বর অনুকরণ করে এবং মুখের আহার দিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া কুক্কুরকে আলিঙ্গন করিতে যায়। রাজা বল, গরীব বল, ধনী বল, পণ্ডিত বল সকলেই স্ব স্ব বিভবের বলে সম্ভ্রম পাইয়া থাকেন। চরিত্রের মান বিভবে নয়—চরিত্রের মান স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। চরিত্রবানের প্রতি আদর হৃদয়ের আদর। চরিত্রবানের প্রতি শ্রদ্ধা আন্তরিক শ্রদ্ধা। সে আদর সে শ্রদ্ধা নড়িবার নহে—টলিবার নহে। মধুর চরিত্র ভাল, তাই সে লাহিড়ী পরিবারে, হোসের কেরাণী দলে ও কলেজের ছাত্রমণ্ডলে তাহার পদোচিত আদর শ্রদ্ধালাভ করিতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মলার কার্য্য।

লোকে বলে, "বসিতে পারিলে শয়ন স্থানও মিলিবে।" এ কথা ঠিক। রেলওয়ে শকটে আরোহণ কর, জনতায় প্রথমতঃ দাঁড়াইবার স্থান পাইবে না। বহু ক্লেশে দাঁড়াইলে, বহু ক্লেশে একটু বসিলে, পরে শকটরাজ্যের তুমিই রাজা। তোমার শয়ন ও উপবেশনের স্থানের অভাব হইবে না। তুমি কোন আদালতে উকীল হইলে, সকল উকীলেরা তোমাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন, তোমাকে বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন, তুমি অটল অচলভাবে স্থায়ী হইয়া রহিলে। ক্রমে দুই একটি মোকদ্দমা পাইতে লাগিলে, দুই একটি বন্ধু জুটিল, কালে তুমি আদালত-রাজ্যে উকীলরাজ হইয়া বসিলে। নববধূ কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া পতি ও শ্বশুর-পরিবারে ঘৃণিতা হইলেন, স্বামীর

শয়নগৃহে স্থান পাইলেন না, পরে স্বামীর শয়নগৃহে ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিতে পাইলেন। কালে সেই বধূ সেই পরিবার রাজ্যে বধূরাণী হইয়া উঠিলেন। সংসারে সর্ব্বত্র এই রীতি। এইরূপে সংসারে প্রবেশলাভ করিতে হইলে গুণের প্রয়োজন। গুণের সাহায্যে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। শকটে উঠিবার সময়ে যদি বলপ্রয়োগ কর, তোমায় অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া নামাইয়া দিবে। দুটী নরমকথা বলিয়া গাড়ীতে উঠিলে. দুটী নরমকথা বলিয়া পাঁচজনের সহিত দাঁড়াইলে, তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, বহু পথ পর্য্যটন করিয়া বহুক্লেশে গাড়ি পাইয়াছ জানাইয়া, একটু বসিবার স্থান লইলে, দুটী শ্লোক বা একটী গল্প করায় বিনা গর্ব্বে প্রকাশ হইয়া পড়িল—তুমি একজন ন্যায়রত্ন। কাজেই তুমি এখন শকটরাজ্যের রাজা। এইরূপ হীনতা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে গুণের পরিচয়ে সংসারের পদ। গুণের অভাবে সংসারে লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা।

পাঠক! অবগত আছ, নির্ম্মলা দাসীকার্য্যে ভাল পরিচয় দিয়া রাধিকা বাবুর শ্বশুরবাটীতে দাসী হইয়াছিল। ভাল দাসী বলিয়া তাহার ভাল আয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে নির্ম্মলার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ। বয়সানুযায়ী তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গও লাবণ্যময়। তবে তাহাকে পঞ্চদশ বর্ষে ত্রয়োদশ বর্ষীয়ার ন্যায় দেখায়। নির্ম্মলা কি এখনও সেই পরিবারের দাসী আছে? যদি নির্ম্মলা অদ্যাপি দাসী থাকে, তবে নির্ম্মলা নিতান্ত গুণহীনা। সে আর দাসী নাই। নির্ম্মলা এই পারিবাররাজ্যে সম্প্রতি মহারাণী।

কর্ত্তা নির্ম্মলার পরামর্শ ব্যতীত সাংসারিক কোন কর্ম্ম করেন না। গৃহিণী নির্ম্মলাব্যতীত জানেন না। পারিবারিক তহবিল নির্ম্মলার হাতে। পারিবারিক জমাখরচ নির্ম্মলা লেখে। পারিবারিক ভাণ্ডার,

গৃহের চাবি, নির্ম্মলার হাতে। কর্ত্তা ডাকেন—'মা নির্ম্মলা' বলিয়া। গৃহিণীর ডাকও অনুরূপ নহে। বাটীর বালক বালিকারা ডাকে—নির্ম্মলা দিদিবাবু।

কর্ত্তা গৃহিণীতে বিবাদ হইলে নির্ম্মলা ভিন্ন আর কাহারও ভঞ্জন করিবার সাধ্য নাই। কর্ত্তার কথায় গৃহিণীর মান হইলে, সে মান নির্ম্মলাই ভঞ্জন করে। বালক-বালিকাদলে বিবাদ হইলে, নির্ম্মলাই বিচার করে। ভৃত্য-পরিচারিকাদলে কলহ হইলে, নির্ম্মলাই তাহার মীমাংসা করে। এ সময়ে প্রাচীন ভৃত্য বা পরিচারিকা কেহ ছিল না। নূতন ভৃত্যবর্গ ভাবিত, নির্ম্মলা কুলীনে বিবাহিতা, কর্ত্তাগৃহিণীর আদুরে কন্যা।

নির্ম্মলা প্রাতঃকালে উঠিয়া বালক বালিকাগণের আহারের বন্দোবস্ত করিতেন। তিনি বাজারের মিঠাই ক্রয় না করিয়া স্বহস্তে লুচি, মোহনভোগ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বালকবালিকাদিগকে আহার করিতে দিতেন। তিনি কর্ত্তা-গৃহিণী, বালক বালিকা, প্রতিদিন কে কি আহার করিবে, তাহার বন্দোবস্ত করিতেন। তিনি নিজে তরকারী কুটিতেন। ভৃত্য-বর্গের আহারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। বৈকালে বালক বালিকাদের আহারীয় দ্রব্য তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন। রাত্রে বালক-বালিকাদিগকে লইয়া শয়ন করিতেন। বালক-বালিকারা তাঁহার নিকট শয়নের জন্য বিবাদ করিত। তাহারা তাঁহার গল্প, উপকথা, একমনে শ্রবণ করিত। পান সাজা, শয্যা ঝাড়া, বাজারের পয়সা দেওয়া, ভাণ্ডার হইতে দ্রব্য বাহির করা, প্রতিদিনের পরিধেয় ঠিক করা, নির্ম্মলার নিত্য কর্ম্ম ছিল।

রজকগৃহে বস্ত্র প্রেরণ ও গ্রহণ, গোপের হিসাব রক্ষণ, ভৃত্যবর্গের বেতন দান, টেক্স আদির রসিদ রাখা, নির্ম্মলার সাময়িক কার্য্য ছিল।

পারিবারিক নব বস্ত্র ক্রয়,গহনা গঠন,ভৃত্যাদি পরিবর্ত্তন ইত্যাদি কার্য্যের ভারও অনেক সময়ে নির্ম্মলার উপর পড়িত। দর্জ্জির হিসাব রাখা, শীতের প্রারম্ভে ও শেষে শীতবস্ত্র বাহির করা ও তুলিয়া রাখা, পিত্তল কাঁসার দ্রব্যাদি ক্রয় বা বদল করা, সকলের ভাল পোষাকের যত্ন করা ইত্যাদি কার্য্যের ভার নির্ম্মলার উপর ছিল। নির্ম্মলার গৃহিণীপনায় রাধিকা বাবুর শ্বশুর বাটীতে কোন সময়ে কোন দ্রব্যের অভাব হইত না। দুই প্রহর রাত্রিতে জামাতা কি কুটুম্ব আসিলে, কি ভোজন দ্রব্য, কি পানীয় দ্রব্য কিছুই বাজার হইতে আনিতে হইত না। দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, লুচি, মোহনভোগ, সন্দেশ, মিঠাই এ বাটীতে সকল সময়ে থাকিত। সর্ব্ব প্রকার তরকারী কিছু কিছু সঞ্চিত থাকিত। চাউল, ডাউল, লবণ, তৈল, মরিচ, মসলার কোন সময়েই অভাব হইত না।

নির্ম্মলার শিক্ষায় বালক বালিকা শিষ্ট, শান্ত ও বিনীত হইয়াছিল। চাকর ও পরিচারিকাগণ কলহ পরিহার করিয়াছিল। কর্ত্তা গৃহিণীর মধ্যেও কলহ কম পড়িয়াছিল।

গৃহিণী কখন স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেন, "দেখ, নির্ম্মলাকে কেমন গৃহিণী ক'রে তুলেছি।" এ কথায় যদি কর্ত্তা নিস্তব্ধ থাকিতেন, তাহা হইলে আর কোন গোল হইত না। আর যদি কর্ত্তা হাসিতেন, তবে গৃহিণীর মুখ ভার হইত। কর্ত্তা যদি বেশী হাসিতেন, গৃহিণী ক্রোধভরে বলিয়া ফেলিতেন, "নির্ম্মলাকে আমি তৈয়ারি করি নাই, তবে কি তুমি তৈয়ারি ক'রেছ?"

এই কথার উত্তরে কর্ত্তা একদিন বলিয়াছিলেন, "তুমিই তৈয়া'র ক'রেছ? তুমি পাকা গৃহিণী। তুমি না তৈয়ারি ক'র্লে নির্ম্মলা এমন হ'তই না। তোমার গৃহিণীপনায় দিব্যি খেয়েছি, দিব্যি পরেছি,

দিব্যি সকল সময়ে সকল দ্রব্য কত ঘরে পেয়েছি। মিঠাই সন্দেশ যে কত থাক্‌ত, তার ত শেষ নাই। ছেলেদের যে যত্ন ছিল, তা'ত বল্‌বারই নয়!!"

শুনা গিয়াছে, কর্ত্তার এই উত্তরে গৃহিণী তিন দিন মান করিয়াছিলেন। কর্ত্তার সহিত কথা কহেন নাই ও কর্ত্তার সম্মুখে যান নাই। সে মানও নির্ম্মলাই ভঞ্জন করিয়াছিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মধুর প্রবেশিকা পরীক্ষা।

ইংরাজী ১৮৭২ সালের এপ্রেল মাসের সংবাদ-পত্র সকলে প্রকাশিত হইল, বঙ্গের ছোট লাট মহামতি সার জর্জ ক্যাম্বেল সাহেব বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত হুগলি কলেজের সব ডিপুটী ও কাননগো ক্লাশ ২।৩ বৎসরের মধ্যে উঠিয়া যাইবে। অতঃপর সব ডিপুটী ও কাননগো সকল সোপা-রেশে নিয়োজিত হইবে, এই ক্লাশে, এফ-এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিমাত্র অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণও এই ক্লাশের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, এই ক্লাশে প্রবিষ্ট হইতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের ২৫৲ টাকার উর্দ্ধ বেতনের ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ এই ক্লাশে পড়িতে পারিতেন। এই ক্লাশের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলে সব ডিপুটী হইতেন; এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইলে কাননগো হইতেন। মহামতি ক্যাম্বেল বাহাদুর, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের উন্নতির এই একটী সোপান করিয়া-

ছিলেন। সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রচারিত হইবার কিছু দিন পরে, একদিন একজন এম-এ ক্লাশের ছাত্র, মধুকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া সবডিপুটী ক্লাশে পড়িবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার আর দুইটী সহাধ্যায়ী এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। ক্রমে কলেজের অনেক ছাত্র মধুর পক্ষে সবডিপুটী পরীক্ষা দেওয়া সুন্দর পরামর্শ বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতঃপর মধুর পরীক্ষা আরম্ভ হইল; ছাত্রগণ মধুকে পরীক্ষা করিয়া, স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শানুসারে মধু ঐ এপ্রেল মাসের শেষভাগেই জেনারেল এসেম্ব্লি কলিজিয়েট্ স্কুলের এণ্ট্রান্স ক্লাশে ভর্ত্তি হইল। মধু স্কুলে ভর্ত্তি হইলেও তাহার জলখাবারের দোকানের কোন ক্ষতি হইল না। মধু অতিশয় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন আরম্ভ করিল। এই সময়ে মধুর মনোযোগ সম্বন্ধে দুইটি গল্প বলা যাইতেছে।

১ম গল্প।—মধু পাঠের বিষয়ে এত মনোযোগ দিত যে, তাহার বাহ্যজ্ঞান একেবারে থাকিত না। স্নানের নিমিত্ত, একদিন সে লাহিড়ী বাবুদের পাকশালে যাইয়া তৈল মর্দ্দনের পরিবর্ত্তে গুড় মর্দ্দন করিয়াছিল; গুড় মাখিয়া মধু কলে স্নান করিতে আসিলে, সকলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে, দীনবন্ধু বাবুর "নবীন তপস্বিনী" নাটক বাহির হইয়াছিল। সকলে মধুকে গুড়ের উপর তূলা মাখিয়া হোন্দল কুতকুতে সাজিতে বলিল। মধু তাড়াতাড়ি গুড় ধুইয়া স্নান করিয়া ফেলিল।

২য় গল্প।- যাঁহারা ধনীর সন্তান, লক্ষ্মীর বরপুত্র, তাঁহাদের প্রতি সরস্বতীর অনুগ্রহ কম। রাধিকা বাবুর অন্তঃকরণ অতি মহৎ হইলেও, তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ ভাল লেখা পড়া শিখেন নাই। যাঁহারা

মনোযোগের সহিত লেখা-পড়া শিক্ষা করেন, তাঁহাদের প্রতি সুব্যবহারও তাঁহারা জানিতেন না। রাধিকা বাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ, মধুকে যেমন পূর্ব্বাপর ইহা উহা ক্রয় করিতে বলিতেন, এ সময়েও সেইরূপ বলিতেন। একদিন রাধিকা বাবুর দাদা কৃষ্ণ বাবু, মধুর হাতে একটা পয়সা দিয়া স াঁচি পানের খিলি আনিতে বলিলেন। মধু এক পয়সার কিছু আনিতে হইবে, বুঝিল, কিন্তু কি আনিতে হইবে, তাহা তাহার মাথায় ঢুকিল না। সে পাঠের বিষয়ে একাগ্রচিত্ত ছিল। দোকানে গিয়া মধু এক পয়সার দেয়াশলায়ের বাক্স ক্রয় করিয়া পকেটে রাখিল। উহা কৃষ্ণ বাবুকে দিবার সময়ও সে অন্যমনস্ক ছিল। 'এই লউন আপনার ফুলখড়ি' এই বলিয়া মধু কাগজে মোড়া দেয়াশলায়ের বাক্স ফেলিয়া দিল। কৃষ্ণ বাবু মধুর অন্যমনস্কতায় হাসিয়া উঠিলেন।

এইরূপ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া মধু যথাসময়ে যথানিয়মে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইল। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। মধু প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে জানিয়া কলেজের ছাত্রবৃন্দ, রাধিকা বাবুর পরিবারবর্গ ও তাঁহার শ্বশুর-বাড়ীর সকল ব্যক্তি পরম প্রীত হইলেন। মধু ও নির্ম্মলার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। মধু ও নির্ম্মলা আবার কৃতজ্ঞচিত্তে উপবাসী থাকিয়া যথাশক্তি উপচারে সত্যনারায়ণের পূজা করিল।

যে দিন মধুর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইল, সেই দিন তাহারা যে কিরূপ সুখী হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাহারা মনে করিতে লাগিল, তাহারা যেন স্বর্গের নিকটে নিকটে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে যেন আনন্দতাড়িত খেলা করিতে লাগিল। তাহাদের মন সেদিন কত আশায় ও কত ভরসায় পূর্ণ হইতে লাগিল। আশার

কুহকে সেদিন মধু একবার সবডিপুটীর আসনে বসিতে লাগিল, একবার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইতে লাগিল। তৃতীয়বারে তদপেক্ষা অদ্ভুত কোন জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। নির্ম্মলা কখন শিক্ষিতের গৃহিণী, কখন রাজার রাণী হইয়া রাণী রাসমণি বা তাঁহার স্বজনের বাড়ী নিমন্ত্রণে চলিল; আশার মোহে তাহাদের মন কত খেলা খেলিতে লাগিল; কত খেলা ভাঙ্গিতে লাগিল; কত জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতে লাগিল; কত জাগ্রত স্বপ্ন ভাঙ্গিতে লাগিল. কত জাগ্রত স্বপ্ন যাইয়া যাইয়া, আসিয়া আসিয়া সুখের সাগরে তরঙ্গ উঠাইয়া উঠাইয়া, নির্ম্মলা ও মধুকে নাচাইতে লাগিল।

পাঠক! তুমি হয় ত শিক্ষিত মধুর সত্যনারায়ণের পূজায় চমৎকৃত হইলে। তুমি যদি ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান হও, তবে মুখ ফিরাইয়া আমার উপন্যাস ফেলিয়া একটু সরিয়া বসিবে। ভাই! গুটিকত কথা বলি, একটু মন দিয়া শুন,—তুমি যদি ধর্ম্ম মান, তবে ধর্ম্ম না থাকা অপেক্ষা কোন ধর্ম্ম থাকা ভাল স্বীকার করিবে। মধুর ধর্ম্ম আছে, না হয় সে হিন্দু ধর্ম্মই হইল। তবে আমার উপন্যাস হাতে তুলিয়া লও। এক্ষণে তবে তোমার সহিত বিচার: তোমার ধর্ম্ম ভাল, না আমার ধর্ম্ম ভাল? আমি বলি, তুমিও বোধ হয় স্বীকার করিবে, সকল ধর্ম্মেরই মূল কথা কয়েকটী এক, অর্থাৎ ধর্ম্মের মূল-নীতি-সূত্র গুলি এক। একথা যদি স্বীকার কর, তবে স্বীকার কর, তোমার ধর্ম্ম ও আমার ধর্ম্ম এক। যদি বল, তুমি নিরাকারের উপাসক, আর আমি পুতুলের পূজক; তাহার উত্তরে আমি এই বলি, উভয়কেই যদি বঙ্গোপসাগরে পড়িতে হয়, তবে তুমি সুসভ্যজনপদসেবিত শস্যশ্যামল আর্য্যাবর্ত্ত দিয়াই প্রবাহিত হও, আর আমি তিব্বতের মরুভূমি হইয়া আসামের পাহাড়

কাটিয়াই যাই, তাতে আর প্রভেদ হইল কি? যদি তুমি বল, তোমার নিরাকার উপাসনার পদ্ধতি উচ্চ, আর আমার সাকার উপাসনার পদ্ধতি নীচ, তাহা হইলেও ভাই আমি তোমার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। তুমি কেবল কথা দিয়া তোমার ঈশ্বরকে তুষ্ট করিতে চাও, আমি কথার সঙ্গে সঙ্গে সকল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য দ্রব্য দিয়া আমার দেবতাকে তুষ্ট করিতে চাই। ভাই, তুমি ঈশ্বরের কেবল কর্ণ আছে জ্ঞান কর; আমি আমার ঈশ্বরের সকল ইন্দ্রিয় আছে জ্ঞান করি। তুমি তোমার ঈশ্বরের নিরাকার মূর্ত্তি ভাব. আমি আমার ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি সম্মুখে রাখি। আচ্ছা ভাই, দুইটি স্ত্রীলোকের পুত্র মরিয়াছে। একজন দিবারাত্রি পুত্র পুত্র বলিয়া কাঁদে আর একজন একটী মাটীর পুত্র গড়িয়া বসনভূষণে সাজাইয়া কোলে করিয়া কাঁদে। বল দেখি পুত্রশোকে অধিকতর উন্মত্তা কে? যদি শেষোক্ত স্ত্রীলোককে বেশী উন্মাদিনী বল, তবে আমারই ধর্ম্মোন্মত্ততা বেশী। আর যদি বল, প্রথম স্ত্রীলোক বুদ্ধিমতী, দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটী বোকা, এ কথায়ও আমি দুঃখিত নহি। হউক হিন্দুর ধর্ম্ম বোকা-বুঝানের ধর্ম্ম, আর নয় হিন্দুধর্ম্ম উন্মাদের ধর্ম্ম। এই দুই কথাতেই আমি রাজি আছি। তোমার ধর্ম্মে ভাই, নিরাকারের উপাসনা সকলে করিতেও পারে না, বুঝিতেও পারে না। গাছ হউক, পাথর হউক, মাটির পুতুল হউক, যাহাতে যাহার ভক্তি বিশ্বাস হয়, সেই তাহার ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ; তাঁহাকে রাম, কৃষ্ণ, কালী, হরি, পুরুষ, প্রকৃতি যাই কেন বলনা, তিনি ত বুঝিবেন, আমি ভক্তিবিশ্বাসে তাঁহাকেই ডাকিতেছি। তিনি বুঝিয়া লইবেন, আমার ভক্তিবিশ্বাস। তবে ভাই! উভয়েই একস্থানে দাঁড়াইলাম। তবে ভাই, আমাকে ঘৃণা করিও না, দূরে ফেলিও না। মধু

সত্যনারায়ণের পূজা করিল, তাহাকে তোমাদের দলে মিশাইয়া লও।

প্রবেশিকা পরীক্ষার কয়েক মাস পরে মধুর সবডিপুটি ক্লাশে ভর্ত্তি হইবার সময় আসিল। দোকানের ভার সে আর এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করিল। তাহার সহিত বন্দোবস্ত হইল, সে মধুকে মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া দিবে। সে মধুর দোকানের মূলধন ৮০৲ টাকা বুঝিয়া লইল। মধু যখন ফিরিয়া আসিবে, তখন ৮০৲ টাকা মূলধনের সহিত তাহার দোকান তাহাকে বুঝাইয়া দিবে। অধ্যক্ষ জার্ডিন সাহেব হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ থোয়েট-সাহেবের নিকট মধুর জন্য এক সুপারিস পত্র দিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মধুর সবডিপুটী পরীক্ষা।

হুগলি কলেজের সম্মুখস্থ বৃহৎ প্রাঙ্গণ। হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ, হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজসাহেব, ডাক্তার সাহেব, ডিষ্ট্রীক্‌ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রভৃতি অনেক শ্বেত ও কৃষ্ণকায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক এক মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন। কতকগুলি সুন্দর সুন্দর অশ্ব তাঁহাদিগের সম্মুখে আনীত হইয়াছে। সবডিপুটী পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ, অশ্বারোহীর বেশ ধারণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রথমে বারজন এক সঙ্গে অশ্বচালনা করিলেন। একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেন। চারিজন কোন মতে অশ্ব চালাইয়া আসিলেন। তিনজন কতক দূর অশ্ব চালাইতে পারিলেন। একজন অশ্বে উঠিতেই পারিলেন না। তিনজন অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন।

দ্বিতীয়বারে আর বারজন অশ্বে উঠিলেন। তৃতীয়বারে আর বারজন।• এইরূপে কয়েকবার অশ্ব দৌড়ান হইল, প্রত্যেকবারের ফলই প্রায় এক হইল। আমাদিগের মধু আজ অশ্বারোহণের পরীক্ষার্থী। সে দ্বিতীয়বারে অশ্বচালনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে।

ঘোড়দৌড় পরীক্ষার এক সপ্তাহ বাদে সন্তরণের পরীক্ষা হইল। সন্তরণের পরীক্ষায়ও মধু ভাল ফল দেখাইতে পারিল। সন্তরণের পরে লিখিত বিষয় সকলের পরীক্ষা গৃহীত হইল। পরীক্ষার বিষয় ছিল, ইংরাজী ভাষা, আইন, গণিত, জরিপ ও নক্সা প্রস্তুতকরণ। মধু সকল বিষয়ের পরীক্ষায় যথারীতি উপস্থিত হইল। পরীক্ষান্তে সবডিপুটী ক্লাশের ছুটি হইল।

সবডিপুটি ক্লাশে পড়িবার সময়ে, নবীনচন্দ্র সরকার নামক এক ব্যক্তির সহিত মধুর সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। নবীন মধুর সজাতি, নবীনের বয়স ২৪।২৫ বৎসর। নবীন হাবড়ার কোন ডিপুটি ম্যাজি-ষ্ট্রেটের কোর্টের ক্লাক। মধু ও নবীন এক সঙ্গে কলিকাতায় আসিবে, স্থির হইল। নবীনের বাড়ী কলিকাতায় ছিল।

নবীন ও মধু একসঙ্গে হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ থোয়েট্ সাহেবের নিকট বিদায় লইতে গেল। থোয়েট্ সাহেব নবীন ও মধুকে চিনিতেন। তাহাদিগকে ভাল ছাত্র বলিয়া জানিতেন এবং তাহাদের পাশ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিতেন না। তাহারা সাহেবের নিকট বিদায় লইতে গেলে, তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া সাহেব কহিলেন, "তোমারত এখন দুই চারি মাসের মধ্যে সবডিপুটি হইবে, দুই চারি বৎসরের মধ্যে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে। ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে এক একজন এক এক মহকুমার কর্ত্তা হইয়া বসিবে। অন্য অন্য কার্য্যের সহিত বিচারের

গুরুভার তোমাদের হস্তে অর্পিত হইবে। তোমাদের জাতীয় লোকেরা বুদ্ধিমান্ ও সুবিচারক বলিয়া স্বীকার করি; কিন্তু তোমাদের জাতীয় লোকেরা বড় ভীরু ও কাপুরুষ; বিচারের ভার বড় গুরুভার। লোকের ধন, মান, সম্ভ্রম তোমাদের বিচারের উপর নির্ভর করিবে। তোমাদের জাতীয় লোকেরা যে বিচারে অক্ষম, তাহা আমরা বলি না, কিন্তু তাহারা ভীরুতায়, আপীলের ভয়ে সত্যের অপলাপ করিয়া থাকে। তাহারা সাক্ষীর জবানবন্দী পরিবর্ত্তন করে। যে স্থলে তাহাদের সরা-সারী বিচারের ক্ষমতা থাকে, সে স্থলে তাহাদের যে পক্ষে অনুকূল মত হয়, তাহার সুবিধার কথা কয়েকটী লিখিয়া বিপক্ষের কথা একেবারে পরিহার করিয়া থাকে। এটী তোমাদের জাতীয় লোকের ভীরুতা ও ধর্ম্মহীনতার লক্ষণ। সাক্ষীর জবানবন্দী ঠিক রাখিয়া সত্যের অপলাপ না করিয়া তোমাদিগের মত তোমরা স্বাধীন ভাবে দিতে পার। যে কার্য্যে লোকের ধন, মান, সম্ভ্রম নির্ভর করে, তাহাতে সত্যের অপলাপ করিতে নাই। আমি বড় বড় জজের মুখে শুনিয়াছি এমন কি, তোমাদের বিচার বিভাগের অনেক মুন্সেফ, সবজজ এরূপ সত্যের অপলাপ করিয়া থাকেন। দেওয়ানী বিভাগের অনেক কর্ম্মচারী কোন কোন সময়ে সাদা কাগজ, ফৌজদারী দণ্ডবিধি ও কার্য্যবিধি আইন বাম হাতে রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা কত নিরপরাধ বিচার প্রার্থী ও সত্যনিষ্ঠ সাক্ষীকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিয়া থাকেন। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, তোমরা কখন সত্যের অপলাপ করিও না; নিজের কর্ত্তব্যের অবহেলা করিও না। উপরিতন কর্ম্মচারীকে অযথা তোষামোদ করিও না এবং তাঁহার প্রতি অকারণে অসম্মান প্রদর্শন করিও না।”

নবীন ও মধু সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "পাশ হওয়া সন্দেহের বিষয়। শুনিতেছি, অল্পদিনের মধ্যে এই পরীক্ষা উঠিয়া যাইবে। এই পরীক্ষা উঠিয়া গেলে, অনেক লোকের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে।

সাহেব। বাবু, তোমাদের দেশের লোক বড় হুজুকপ্রিয়। কার্য্যের ফলাফল বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করে না। যদি কোন সংবাদপত্র কাহারও নিন্দা করিল, তবে সকল সংবাদপত্র চিন্তাশূন্য হইয়া তাহার নিন্দা করিতে আরম্ভ করে। মহামতি ক্যাম্বেলের উদ্দেশ্য অতি মহৎ; তিনি অতি চিন্তাশীল লোক। তিনি সবডিপুটী ক্লাশ খুলিয়া, প্রাইমারি শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পাঠের নিয়ম করিয়া, দেশের প্রকৃত উপকার করিতে চাহিতেছেন; আর তোমাদের দেশের লোকে পঞ্চমুখে তাঁহার নিন্দা করিতেছে। সত্য, তিনি ছাত্রহীন কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর কলেজের বি এ, ক্লাশ উঠাইয়াছেন। তাহাতে তোমাদের দেশের কি অনিষ্ট হইবে? ইংরাজী শিক্ষায় অনুরাগ বাড়িলে তোমাদিগের দেশীয় লোকের যত্নে কত কত কলেজ হইবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অসাধারণ লোক, তাঁহার স্কুলের যেরূপ ফল দেখিতেছি, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার স্কুল কালে সংস্কৃত বা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী কলেজ হইবে। কেশববাবুরও একটী কলেজ করার সম্ভব। এই যে সবডিপুটী ক্লাশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাতে তোমাদের দেশীয় কেরাণীগণের চরিত্র বজায় রাখিবার ও উন্নতির পথে লইবার উত্তম উপায় হইয়াছে। আমি জানি, সন্ধ্যার পর দেশীয় পঁচিশ বা ত্রিশ টাকার কেরাণীতে আর ইউরোপীয় জাহাজের নাবিকে কোন প্রভেদ ছিল না। এই ক্লাশ খোলার পর অনেক কেরাণী অধ্যয়নে

মনোনিবেশ করিয়াছে। বাস্তবিক যাহারা কাজ করিতে করিতে ভাল লেখাপড়া শিখে, এই ক্লাশ তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার প্রধান স্থান হইয়াছে।

ন, ম। আজ্ঞা, তা ঠিক। আমাদের দেশীয় লোকের মধ্যে চিন্তাশীল লোকের সংখ্যা অতি অল্প। হুজুকপ্রিয়তাও আমাদের একটী দোষ।

এইরূপ কথোপকথনের পর সাহেব নবীন ও মধুকে দুইখানি সার্টিফিকেট দিলেন। তাহারাও সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া ও নমস্কার করিয়া বিদায় হইল! এস্থলে আমাকে একটি সুবৃহৎ কৈফিয়ৎ দিতে হইতেছে। যাঁহারা জানেন, সবডিপুটি ক্লাশে একুশ বৎসরের কম বয়স্ক ছাত্র ভর্ত্তি হইতে পারিত না এবং যাঁহারা মধুর বয়সের হিসাব করিতেছেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন, মধু সাড়ে ষোল বৎসর বয়সে কি প্রকারে সবডিপুটী ক্লাশে প্রবেশ করিল? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে থাকিবার জন্য অনেক বড়লোকে বয়স সম্বন্ধে যাহা করিয়া থাকেন, মধুও তাহাই করিয়াছিল। এ বিষয়ে মধুকে কেহ দোষ দিতে পারিবেন না। মধু তাহার অভিভাবকগণের আদেশ ও উপদেশক্রমে এই কার্য্য করিয়াছিল। মধু এই বয়সেই পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা হইয়াছিল, তাহার শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট বলিষ্ঠ ছিল। তাহার মুখে দুই অঙ্গুলি লম্বা দাড়ি হইয়াছিল এবং ওষ্ঠের উপর ধনুকের ন্যায় কালগুম্ফের চাপ পড়িয়াছিল। বয়স নির্ণয় করা সহজ নহে। কাহাকেও ষোল বৎসর বয়সে বাইশের মত দেখায়, কাহাকেও বাইশে ষোলর মত দেখায়। কেহ চল্লিশে বৃদ্ধ, কেহ চল্লিশে তরুণ যুবা। এই ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যেই মধু ষোল বৎসর বয়সে বাইশ বৎসর বয়সের মত,

আর নির্ম্মলা সতর বৎসরে চৌদ্দ বৎসরের মত। আর একটি শাস্ত্রীয়োপদেশেও মধুর মিথ্যা বাক্য সমর্থন করিতেছি। বামন কর্ত্তৃক বলি পাতালে নীত হইবার সময়ে শুক্রচার্য্য বলিয়াছেন,—"স্ত্রী বশীকরণকালে, হাস্য-পরিহাসে, বিবাহে বরের গুণানুকীর্ত্তনে, জীবিকাবৃত্তি রক্ষার নিমিত্ত, প্রাণ সঙ্কটে, গো ব্রাহ্মণের হিতসাধনে, এবং কাহারও প্রাণহিংসা উপস্থিত হইলে, মিথ্যা কথন দোষাবহ নহে।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মধুর স্বজনগণ।

মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন. "শরৎকালের জলশূন্য মেঘের নিকট চাতকেও জল চায় না।" মহাকবি সেক্সপিয়র তাঁহার "টাইমন অব্ এথেন্স" নামক নাটকে কালিদাসবাক্যের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সুসময়ে স্বজন বন্ধু অনেক আসিয়া উপস্থিত হন. কিন্তু অসময়ের বন্ধু অনুসন্ধানে পাওয়া ভার। কাব্য, নাটক. উপন্যাস, ইতিহাস ও এমন কি, সংবাদপত্র পর্য্যন্ত এ বিষয়ে ভূরি ভূরি সাক্ষ্য দিতেছেন। নির্ম্মলা ও মধু যখন অনশনে বা অর্দ্ধাশনে জাড়গ্রামে মরিতেছিল, তখন তাহাদিগের বন্ধু ছিল না। এখন মধুর পরিচিত জনসমাজে প্রকাশ এই যে, মধু দুইটা পরীক্ষা পাস করিয়া তিনটা পরীক্ষা দিয়াছে। তাহার শীঘ্র ২০০৲ টাকা বেতনের চাকরি হইবে। কলিকাতায় মধুর কাগজ

কলম কালীর ও সন্দেশ মিঠায়ের দুইখানি দোকান আছে। দুই দোকানের মাসিক আয় ২০০৲ টাকা। এমন মধুর স্বজন কেন জুটিবে না?

জ্ঞানদা, মানদা, বরদা, শারদা, নিস্তারিণী, গজগামিনী প্রভৃতি জাড়গ্রাম অঞ্চলের কলিকাতাবাসিনী পরিচারিকাগণ ও রামচন্দ্র, শ্যামচাঁদ, কার্ত্তিক, গণেশ, কানাই, বলাই প্রভৃতি ভৃত্যগণ যে, এক্ষণে নির্ম্মলা ও মধুর মাসী, পিসী, খুড়ী, জেঠী, দিদি, মাসী, মেসো, পিসে, খুড়ো, জ্যেঠা, দাদা, মামা প্রভৃতি সাজিয়া প্রতিদিন দলেদলে আসিয়া আত্মীয়তার ঘোর ঘটা করিয়া আসিবে যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য নহে। তাহাদের কথা লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। এই স্থলে মধুর প্রকৃত হিতৈষী দুই সদাশয় মহাত্মার ও একটী গ্রাম-সম্পর্কীয় মাতুলের কিছু পরিচয় দিব।

মধুর প্রথম সদাশয় হিতৈষী অভিভাবক রামবাগানের পূর্ব্ববর্ণিত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী উমেশ বাবু। মধু গুরুদাস বাবুর বাটীতে আশ্রয় পাইলেও মধ্যে মধ্যে উমেশ বাবুর নিকট যাইত. উমেশ বাবুর প্রথম পুত্র বর্ত্তমান সময়ে এটর্ণি ও সেই সময়ের বালক, বাবু যোগীনচন্দ্র দত্ত, মধুর অনেক বিষয়ে সহায়তা করিতেন। উমেশ ও যোগীন বাবুর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, মধুর উন্নতি হয়। তাঁহাদের নিকট মধু অনেক বিষয়ে ঋণী।

মধুর দ্বিতীয় হিতৈষী বন্ধু বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়। ইহার নিবাস জাড়গ্রাম। ইনি এক্ষণে মুন্সেফ, ইনিই মধুকে জলখাবার বিক্রেতা করেন। ইনিই মধুকে সবডিপুটি পরীক্ষা দিতে পাঠান। ইনিই নির্ম্মলার অপবাদ দূর করেন, ইনিই মধু ও নির্ম্মলার কলিকাতায়

সুখ দুঃখে সকল সময়ের পরামর্শদাতা ছিলেন। মধুর তৃতীয় আত্মীয়তার ভাণকারী শ্যামসুন্দর বিশ্বাস। ইনি মধুর গ্রাম-সম্পর্কীয় এক খুড়ীর ভ্রাতা, সুতরাং মাতুল। ইহার বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর। ইনি কলিকাতায় তিসি মালের দালালী করিতেন। ইহার বাসা বাগবাজারে ছিল। ইহার বাড়ী কালনার নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামে ছিল।

অম্বিকাবাবু একদিন শ্যামসুন্দর বাবুকে নির্ম্মলার একটা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিতে বলেন। তিনি কয়েকটি সম্বন্ধ আনিয়াছিলেন। তিনি কয়েকবার রাধিকা বাবুর শ্বশুর বাড়ী অর্থাৎ ভাদুরী মহাশয়ের কুমারটুলির বাড়ীতে বরকর্ত্তাদিগকে লইয়া গিয়া নির্ম্মলাকে দেখাইয়াছিলেন। নির্ম্মলা শ্যামসুন্দরকে চিনিত ও তাঁহার সহিত কথা কহিত।

চারিটা সম্বন্ধ আনার পরেই শ্যামসুন্দরের স্ত্রীবিয়োগ হয়। তিনি রাধিকাবাবুদিগের ও ভাদুরী মহাশয়ের বাটীতে মৃতা পত্নীর জন্য অনেক রোদন করিয়াছিলেন। নির্ম্মলা এবং মধুর নিকটেও অনেক রোদন করিয়াছিলেন।

গুরুদাস বাবু যৌবনকালে ছিপে বড় মৎস্য ধরিতে পারিতেন। তিনি অহঙ্কার করিয়া বলিতেন যে, আমি ভাল মৎস্যশিকারী ছিলাম বলিয়া এক্ষণে ভাল মানুষশিকারী হইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে গুরুদাস বাবু মানবচরিত্র উত্তমরূপ বুঝিতেন ও মানবকে উত্তমরূপে বাধ্য করিতে পারিতেন। তিনি দুষ্টলোক দেখিলে তাহার দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিয়া চার ও আধারযুক্ত বঁড়সী ফেলার ন্যায় দুষ্ট লোককে কৌশলে আবদ্ধ করিয়া অপ্রতিভ করিতেন।

একদিন গুরুদাস বাবু শ্যামের স্ত্রীশোকে রোদন দেখিয়া তাহার সহিত নির্ম্মলার বিবাহের প্রস্তাব করিতেছিলেন, হঠাৎ সামান্য মদের গন্ধ পাওয়ায় ঘৃণায় আর সে প্রস্তাব করিলেন না। তিনি আর একদিন মধুকে বলিয়াছিলেন, "নির্ম্মলা যেন শ্যামের সহিত কথা না কহে। শ্যাম নির্ম্মলার বিবাহের কোন সম্বন্ধ আনিলেও বরকর্ত্তাকে যেন নির্ম্মলাকে না দেখায়। শ্যামচাঁদ ভাল লোক নহে, তাহার উদ্দেশ্য মন্দ।" মধু একথা নির্ম্মলাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

পাঠক! এ সংসারে কি সত্য সত্য সুহৃদ্ আছে? ঐশ্বর্য্যানুচর সুহৃদ্ গ্রীষ্মানুচর বিহঙ্গমের ন্যায় দলে দলে আসিতেছে। দুঃসময় রূপ শীতের নিশীথ সময়ে এই বন্ধুর কয় জনকে পাইবে? যে কয়েক দিন তোমার পদ প্রতিপত্তির আশা আছে, যে কয়েক দিন তোমার ভগ্ন গৌরবের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত আছে, ততদিন তুমি অধিকই হউক, আর অল্পই হউক বন্ধু নামধারী স্বার্থসাধক পাইবে। যখন তুমি নৈরাশ্যময় দুর্দ্দিনে পড়িবে, যখন তোমার জীবনে আর সৌভাগ্য চন্দ্রমার উদয়ের বিন্দুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না, তখন তোমার জায়া, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র এবং কন্যারা কে কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহাও বলিতে পারি না। সত্য, পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতা আছে। সত্য, পৃথিবীতে দয়া, মমতা, স্নেহ বাৎসল্য, ভক্তি, প্রেম বিদ্যমান আছে। কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারি না, একেবারে বিন্দুমাত্র স্বার্থ পরিশূন্য কৃতজ্ঞতা, স্নেহ, বাৎসল্য, দয়া, মমতা, ভক্তি, প্রেম আছে কিনা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মধুর পুনরায় দোকানদারী ও নোট প্রাপ্তি।

বাঙ্গালি বাবু, তুমি জজ হও, ম্যাজিষ্ট্রেট্ হও, ডাক্তার হও, উকীল হও, দু-হাজার টাকা মাসিক আয় কর, তোমার কিছুতেই কুলায় না! কেন বল দেখি? তুমিও যদি বা কোন রকমে কাটাইয়া গেলে, তোমার অভাবে তোমার স্ত্রী পুত্রগণ অভাবে পড়ে কেন? তোমার আহারের পারিপাট্য নাই, পরিচ্ছদের আড়ম্বর নাই, তোমার অঙ্গে বিলাসের দ্রব্য মাত্র নাই, তবে তোমার এত অভাব কেন? তুমি বড় অভিমানী, তুমি পরের কাজে মজুরের মত খাটিতে পার, কিন্তু নিজের কাজে হুজুর হইয়া বস। তোমার আহারীয় পরে ক্রয় করিবে, তোমার বসন অপরে রাখিবে, তোমার অন্ন অপরে পাক করিবে। তুমি যদি নিজে এক পয়সার শাক বা মৎস্য হাতে করিয়া আন, তাহা হইলে তোমার চতুর্দ্দশ

পুরুষ নিরয়গামী হয়! তোমার এই অভিমান, অভাবের একটি কারণ। তুমি জীবিত মাতার অশনবসনের তত্ত্ব লও না, কিন্তু মৃতমাতৃশ্রাদ্ধে সামাজিক সুখ্যাতি লাভের মানসে দশসহস্র টাকা ব্যয় কর! তুমি পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য যত্ন কর না, কিন্তু তাহাদিগের বিবাহে দশ সহস্র টাকা ব্যয় কর! তুমি নিজে ক্লেশ পাও, কিন্তু তোমার বার্ষিক দুর্গোৎসবে পাঁচ সহস্র টাকা ব্যয়! এই অভিমান তোমার অভাবের দ্বিতীয় কারণ।

আমাদের মধু অদ্যাপি তোমাদের মত বাঙ্গালী বাবু হয় নাই। সে আবার দোকানদারী করিতেছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নম্র ও বিনীত হইয়াছে। সে দোকানের দ্রব্যাদি নিজে ক্রয় করিয়া আনে; দোকানের জল নিজে তোলে; দোকানঘর নিজে ঝাঁট দেয়। বাঙ্গালি বাবু, তুমি মধুকে বোকা, ব্যাকুব, ছোট লোক বলিতে চাও বল, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। মধু আত্মাদর, আত্মসম্মান, বিদ্যার গৌরব ইত্যাদি বুঝে না বলিতে চাও, বল; এ ছাড়া মধুকে যদি তোমার আর কিছু বলিবার থাকে বল, আমি মধুর পক্ষ হইয়া দুটা কথা বলিব, তাহাতে আপত্তি করিও না। এই তো দেখিতেছি, তোমার মৃত্যু বা পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার পরিজনের অভাবজনিত বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনার এক শেষ হয়। মধুর সপ্তদশবর্ষীয়া ভগিনী অবিবাহিতা। তাহার দুই ভ্রাতা কেবলমাত্র শিক্ষার্থী হইয়াছে। তাহার নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন স্থায়ী আয় নাই। এ সময়ে যদি সে, সবডিপুটী হইবে, এই আশায় বুক ফুলাইয়া, তেড়ি কাটিয়া, চেন ঝুলাইয়া তোমার সঙ্গে বসে, তবে তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীর উপায় কি হইবে? তুমি বিজিত, তাহার উপরে পরের মজুর। তুমি কার্য্যালয়ে মজুর হইয়া বাটীতে হুজুর

সাজিয়াই ত সর্ব্বনাশ করিতেছ। তুমি যদি নিজের কাজ নিজে একটু করিতে, তাহা হইলে এত ঠকিতে না। তুমি ক্ষণিক প্রশংসা ও পদের জন্য লালায়িত না হইয়া, যদি নিজের অবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টি করিতে, তবে এত ঠকিতে না।

এক দিন চারিটা বাজিয়া গেলে, মধু, দোকানঘর ঝাঁট দিতে দিতে একটি লাল কিতায় বাঁধা এক তাড়া কাগজ পাইল। কাগজের তাড়া বাক্সের উপর রাখিয়া মধু ঘর ঝাঁট দিল, ঘর ঝাঁট দিয়া দোকানের কলসীগুলি জলপূর্ণ করিল। অতঃপর মধু দোকানের হিসাব মিলাইল। তাহার নিয়ম ছিল, প্রতিদিন দোকানের আয় ব্যয় মিলাইয়া, যে দোকান হইতে সে মিঠাই সন্দেশ ক্রয় করিত, দোকানের মূলধন, সেই দোকানে রাখিত, এবং প্রতিদিন যাহা লাভ হইত, তাহা গৃহে লইয়া যাইত। সপ্তাহের অন্তে লাভের টাকা নির্ম্মলার নিকট দিয়া আসিতেন।

সর্ব্ব কর্ম্ম শেষ করিয়া মধু বাটী আসিবার সময়ে একবার ভাবিল, কাগজের তাড়া দোকানের বাক্সে রাখিয়া যাই। আবার ভাবিল, কাহার কি কাগজ দেখিয়া রাখিয়া যাই। কাগজের তাড়া খুলিয়া মধু শিহরিয়া উঠিল। সে দেখিল, এ কাগজতাড়া প্রকৃত কাগজ নহে, এ দশ টাকা করিয়া ৫০ খানিতে ৫০০ পাঁচ শত টাকার নোট। নোট পাইয়া কিছুকাল ভাবিল; পরে স্থির করিল, নোটের তাড়া সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া যাই। আবার মনে করিল, নোটের কথা জার্ডিন সাহেব, গুরুদাস বাবু, উমেশ বাবু, অম্বিকা বাবু প্রভৃতিকে জানাই, তাঁহারা যে পরামর্শ দেন, সেই রূপ কার্য্য করিব। এই রূপ মীমাংসা করিয়া মধু সকলের পরামর্শ গ্রহণ করিল; নোটগুলি

সম্বন্ধে সুলভ সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল, কলেজের গায়ে, কলেজের প্রাচীরের গায়ে ও প্রত্যেক দ্বারে নোট সম্বন্ধে মধু নিজে বিজ্ঞাপন আঁটিয়া দিল। হাতে লেখা বিজ্ঞাপন গুলি জার্ডিন সাহেবের দ্বারা স্বাক্ষর করাইল। সুলভ সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনে অম্বিকা বাবুর নাম থাকিল। নোটগুলির নম্বর মধুর নিকটেই রহিল।

মধু দোকানদারী করিবার সঙ্গে সঙ্গে এ সময়েও পড়া শুনা করা ভুলে নাই। সে এ সময়ে ইচ্ছামত ভাল ভাল ইতিহাস, জীবন-চরিত, সাহিত্যগ্রন্থ ও আইন পুস্তক পাঠ করিত; মধুর বিশ্বাস ছিল, সকল সময়েই পাঠ করিতে হয়। অধ্যয়নের সময় অসময় নাই। কেবল পরীক্ষার পূর্ব্বে পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রাণপণ যত্নে পড়িতে হইবে, এ কথা মধু কখনও ভাবিত না। তাহার ইচ্ছা ছিল, প্রতিদিন কিছু পাঠ করিব ও কিছু না কিছু নূতন কথা শিখিব। এই সময়ে গুরুদাস বাবুর বাটীতে মধুর আর ভৃত্যের ন্যায় হীন অবস্থা ছিল না। মধু এক্ষণে বাটীর পাঁচ জনের মধ্যে একজন হইয়াছিল। বাটীর কর্ত্তৃপক্ষ ব্যক্তিগণ ভিন্ন এ সময়ে বাটীর সকলেই মধুকে মধুবাবু বলিত।

ছেলেদলে এ সময়ে মধু একজন বুদ্ধিমান লোক। বৃদ্ধ গুরুদাসের নিকটে মধু একজন বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, কর্ম্মঠ, কৃতবিদ্য লোক। গুরু-দাস বাবু মধুকে সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিতেন। তাঁহার পৌত্রদিগের মধ্যে কেহ কোন পরীক্ষায় পাস করেন নাই বলিয়া, বৃদ্ধের বড় আক্ষেপ ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন, তাঁহার বাটিতে থাকিয়া, তাঁহার অন্ন আহার করিয়া, কেহ বুঝি লেখা পড়া শিক্ষা করিতে পারিবে না। মধুর শিক্ষায় বৃদ্ধের সে আক্ষেপ দূর হইল। লাহিড়ী-পরিবারে মধু এখন সকল কার্য্যেই থাকিতেন এবং সকল পরামর্শেই নিজ মত প্রকাশ করি-

তেন। এই সময়ে এক দিন এক সাহেব ও তাঁহার বিবি গুরুদাস বাবুর নিকটে আসিলেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন, যদি গুরুদাস বাবু তাঁহাদিগকে কিছু টাকা কর্জ্জ দেন, তাঁহারা কলিকাতায় একটী থিয়েটার খুলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিতে পারেন। বৃদ্ধ মধুকে ডাকিয়া সাহেব ও মেমের সহিত আলাপ করিতে দিলেন। মধু সাহেব ও মেমের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধ আনন্দের সহিত সে কথা শুনিতে লাগিলেন। সে দিন সাহেবকে টাকা দেওয়া হইল না, দুই দিন পরে তাঁহাকে আসিতে বলা হইল। টাকা দেওয়া হয় বা না হয়, বিবেচনা করিয়া দেখিয়া সেইদিন সাহেবকে বলা হইবে।

এই সাহেবকে টাকা দেওয়া না দেওয়ার পরামর্শেও মধুর মত গৃহীত হইয়াছিল। সাহেব, গুরুদাস বাবুর হৌসের বড় সাহেবের চিঠি আনিয়া ঋণ পাইয়াছিলেন। এই সাহেবই কলিকাতার সুবিখ্যাত ইংরাজ থিয়েটারের স্থাপয়িতা। এই সময়ে মধুর সবডিপুটী পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর সহিত কথা হইলে, বৃদ্ধ বলিতেন, "যাক, সবডিপুটী না হ'তে পারিস, বড় সাহেবকে ধ'রে একটি বড় কাজ ক'রে দিব। যখন দুটা পাস ক'রেছিস, তখন আর তোর চাকুরির ভাবনা কি? সাবধান! সাবধান! কলিকাতার বাতাস যেন গায়ে না লাগে। দুটি কাজ ক'রোনা, তা হলেই মানুষ হ'তে পারবে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যোতির্ব্বিদ্‌।

মানব-মন উচ্চ আশায় ঈপ্সিতরত্ন লাভের লোভে ব্যাকুল। এই কারণে ভবিষ্যৎকালরূপ খনিগর্ভ খনন করিতে অনেকেরই বাসনা। জ্যোতির্ব্বিদ, ভাবী কালের খনক। চিত্তের অবস্থানুসারে সেই খনকের প্রতি বিশ্বাসের তারতম্য হয়।

কলিকাতায় বটতলার বেণীমাধব দের পুস্তকের দোকানে উড়িষ্যা-দেশীয় গণেশচন্দ্র জ্যোতির্ব্বিদ বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকট অনেক স্ত্রী পুরুষ আসিয়াছেন। তিনি ধীর ও স্থিরভাবে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। অনেকে তাহার অতীত ঘটনার প্রশ্নগণনায় চমৎকৃত হইতেছে।

এই জনতার মধ্যে ভাদুড়ী বাড়ীর অর্থাৎ রাধিকা বাবুর শ্বশুর বাড়ীর নূতন ঝী নামে একটি ঝী আছে। নূতন ঝীর বয়স চল্লিশ বৎসর, বর্ণ

কাল, দন্ত উচ্চ, চক্ষু উজ্জ্বল ও বৃহৎ বটে, কিন্তু গোল ; চুল গোছে অল্প, কিন্তু দীর্ঘ। তার মুখে বসন্তের দাগ। ঝী ও গণনা করাইবার আশায় বসিয়াছিল।

মধুর দালাল মামা শ্যামচাঁদ চিৎপুর রোডের পূর্ব্ব পার্শ্ব হইতে হস্ত-সঙ্কেত দ্বারা নূতন ঝীকে ডাকিল। নূতন ঝীর আসিতে বিলম্ব হইল। তখন শ্যামচাঁদ বড় করিয়াই বলিল, "কিহে ঝী! ভোগল-ঠাকুরের ভোগলামতে একেবারেই ভুলে থাক্‌লে?" এ কথাগুলি জ্যোতিষীর কর্ণে গেল। জ্যোতিষী কিছুই বলিলেন না।

কিছুকাল পরে শ্যামচাঁদের নিকটে নূতন ঝী আসিল। শ্যাম ও নূতন ঝীতে অনেক কথা হইল। অনেক মুখ নাড়ানাড়ি হইল। কত হস্তভঙ্গী করা হইল ও কত হাসাহাসি হইল। সে সব কথা কেহই শুনিতে পাইল না এবং আমাদিগের জানিবারও প্রয়োজন নাই। পরিশেষে শ্যামচাঁদ বড় করিয়া বলিল, "এ কিস্তীর দাঁড়ী মাঝী সব তুমি।"

নূতন ঝী উত্তর করিল, "মহাজনে কিস্তী ছাড়িতে বলিলেই ছাড়ি।"

শ্যাম। বল্‌বে বল্‌বে। মাল-বোঝাই সারা কিস্তী আর কতদিন ঘাটে রাখিবে?

নূতন ঝী। আচ্ছা, তবে আজকার মত আসি, শুক্রবারেই দেখা হবে।

শ্যাম। আচ্ছা।

এই কথোপকথনের পর শ্যামচাঁদ দক্ষিণাভিমুখী ও ঝী বেণীমাধব বাবুর দোকানাভিমুখী হইল। একটু ছাড়াছাড়ি হইলেই ঝী শ্যামকে ডাকিল এবং শ্যাম ঝীর নিকট আসিলেন।

ঝী বলিল, "আপনি যাই বলুন, ঐ গণক ঠাকুর গণেন ভাল। আপনি গণা'য়ে দেখুন না।"

শ্যাম। আচ্ছা চল, দেখি।

শ্যামচাঁদ বেশ একটা সৌখীন গোছের লোক। শ্যামচাঁদ বড় লম্বাও নয়, বড় খাটও নয়, মধ্যমাকৃতি লোক। হাড়ে মাসে জড়ান বলিষ্ঠ শরীর, শরীর আকারের পরিমাণে একটু স্থূল, ওষ্ঠ লাল ও পুরু, দাঁত সাদা ও ছোট, গালটা একটু বড়, গোঁপ মহিষশৃঙ্গজাতীয়। নাকটী অল্প মোটা, চক্ষু দুইটি বড়, গোল ও লাল। মাথায় যেন কাল মেঘের মত কোঁকড়ানে কোঁকড়ানে চুল, ও চুলে তেড়ী; শ্যামের বাম করে হীরার অঙ্গুরীয়, ডা'ন করে সোণার আঙটি, পায়ে সাহেব বাড়ীর জুতা, পরিধান ভাল শিমলাই ফিতে পেড়ে ধুতি; গায়ে বসন্তকালোচিত উড়ানি ও জামা, হাতে রূপাবান্ধা ছড়ি। শ্যামচাঁদের বর্ণ কাল। পরিচ্ছদ অত্যন্ত পরিষ্কার, বুকের পকেটে সোনার শৃঙ্খলযুক্ত ঘড়ি।

শ্যামচাঁদ জ্যোতিষীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমি কি ভেবে এসেছি, বল দেখি?"

জ্যোতিষীর ঠিক আছে, শ্যামচাঁদ তাঁহাকে এই মাত্র ভোগল বলিয়াছে। যে লোক ভোগল বলিয়া আবার আসিল, জ্যোতিষী ভাবিলেন, হয় সে বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছে, না হয় তাহার প্রকৃত গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছে। গণক গম্ভীরভাবে শ্যামের প্রতি দৃষ্টি করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ গণনা করিয়া কহিলেন,

"আমরা উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণ, আমরা গণনায় চাতুরী করি না. আপনি এক সঙ্গে দুই বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন। এক বিষয়ে মন স্থির করুন।"

শ্যামচাঁদ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন—"আচ্ছা, আমি এক বিষয়ে মন স্থির করিলাম।"

গণক কিছুকাল গণনা করিয়া বলিলেন, "আপনি নিজের পরমায়ুর বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। আমি পরমায়ু বলিব না, আপনি বাড়ী যাউন, আপনার টাকাও আমি লইব না।"

শ্যামচাঁদ চমৎকৃত হইয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া নিজের পরমায়ুর কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, "আমি যদি আর পাঁচ দিন বাঁচি, তাহাও ত আমাকে বলা উচিত, আমি সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারি।"

গণক কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি সত্য কথা বলিব। আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। পাঁচ দিনের দিনই আপনার বড় বিপদ দেখিতেছি। জ্যোতিষে বলে, প্রশ্নের এরূপ ফলে জীবন সংশয়।"

শ্যাম। (ঈষৎ হাসিয়া) আচ্ছা, আমি পাঁচদিনের দিন কিরূপে মরিব?

গণক। আপনার অপঘাত মৃত্যু হইবার সম্ভব।

শ্যাম। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কি বল দেখি? আমি সে বিষয়ে মনস্থির করিলাম।

গণক। (গণনা করিয়া) আপনার চিন্তা জীববিষয়ে।

শ্যাম। কি জীব?

গণক। (গণিয়া) শ্রেষ্ঠজীব, সমশ্রেণী জীববিষয়ে। অর্থাৎ স্বজাতীয় জীব বিষয়ে।

শ্যাম। স্বজাতীয় জীব বিষয়ে কি চিন্তা?

গণক। (গণিয়া) মিলন চিন্তা।

শ্যাম। হবে কি?

গণক। (গণিয়া) হবে না, না, না, অসম্পূর্ণ (চিন্তিত ভাবে) যাওয়া দেখ্‌ছি, এক সঙ্গে থাকাও দেখ্‌ছি, পরিণাম—উঃ!

শ্যাম। "পরিণাম—উঃ" কি ঠাকুর?

গণক। আমাদের কথা আপনারা বিশ্বাস করিবেন না। আমাদের কথার কোন সার নাই। গণনা বড় কঠিন বিষয়। সকল সময় ঠিক হয় না। আমি যা বল্লেম, তা আপনি বিশ্বাস করিবেন না। লগ্ন ঠিক নাই। গণনা ঠিক হয় নাই।

শ্যামচাঁদ এই কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি গণককে এক পয়সাও দিলেন না। তিনি বলিয়া গেলেন, গণকের কথা তিনি কোন দিন বিশ্বাস করেন না। তা আর আজ করিবেন কি? নূতন ঝী ও শ্যামচাঁদ এক সঙ্গে উঠিয়া গেলেন।

তাঁহারা উঠিয়া গেলে, গণক ঠাকুর বলিলেন, "এই লোকটী আজ হইতে পঞ্চম দিনে দালানের ছাদ চাপা পড়িয়া সাংঘাতিক আঘাত পাইবে ও ছয় দিনের দিন আড়াই প্রহরের সময় মারা পড়িবে। আপনারা আমার কথা ঠিক রাখিবেন।"

ইহার পরে অনেকে অনেক কথা গণাইতে আসিল; গণক ঠাকুর আর গণনা করিলেন না। তিনি কাহারও টাকা লইলেন না। তিনি বলিলেন, বেলা অধিক হইয়াছে এবং তাঁহার চিত্ত স্থির নাই। তিনি আরও বলিলেন, লোকটাকে মৃত্যুর কথা বলিয়া ভাল করি নাই। বেণীমাধব বাবুর একছড়া মূল্যবান্ হার হারাইয়া ছিল, তিনি তাহারই গণনা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে হার অপহরণকারীর নাম, ধাম, বয়স ইত্যাদি গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন। বেণী বাবু তস্করকে চিনিয়াও আপাততঃ নিজের দোকানের ভৃত্য জানিয়া

কিছু বলিলেন না। মাসান্তে তাহার বেতন দিয়া তাহাকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিলেন। অনেকে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিল, তস্করকে সোপে করিয়া পুলিশে দেওয়া হউক। তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "পোষা কুকুর স্বহস্তে মারিব না। যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে নিজ কর্ম্মের ফল নিজেই ভোগ করিবে। মানুষ মানুষকে দণ্ড দিবার কেহ নহে।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

টেলিগ্রাম।

১৮৭৪ অব্দের ফাল্গুন মাসের শেষভাগ; কলিকাতায় বিলক্ষণ গরম পড়িয়াছে। সহরের স্থানে স্থানে দুই একটা লোকের কলেরা হইতেছে। সংবাদপত্রে মফঃস্বলের স্থানে স্থানে কলেরার কথা প্রকাশিত হইতেছে।

বেলা আট্টা বাজিয়াছে। মধু কৃষ্ণ ও রাধিকাবাবুর সহিত কথোপকথন করিতেছে। এমন সময়ে মধুর নামে এক টেলিগ্রাম আসিল। রাধিকাবাবু মধুর নামের টেলিগ্রাম দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"থোয়েট সাহেব তোমার পাশের সংবাদ পাঠাইয়াছেন।" মধুও কোন শুভসংবাদের আশা করিয়াছিল।

সংসারে কয়জনের আশা পূর্ণ হয়? যে কার্য্যে সর্ব্বনাশের ভয় করিতেছি, তাহাতেই হয় ত সর্ব্বস্ব রক্ষা হইবে। যে কার্য্যে সকল

আশা স্থাপন করিতেছি, সেই কার্য্যেই হয় ত সর্ব্বনাশ হইবে। মধুর টেলিগ্রাম এই :—"বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় টেলিগ্রাম করিতেছেন,—তোমার মাতার কলেরা হইয়াছে, শীঘ্র বাড়ী আসিবে। বেদানা আনিবে।"

টেলিগ্রাম পাইয়া মধু শিহরিয়া উঠিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গুরুদাস বাবু মধুকে শীঘ্র স্নান আহার সারিতে বলিলেন। মধুর স্নান আহার সারা হইলেই গুরুদাসবাবু তাহাকে দুই সের বেদানা ও কিছু টাকা দিয়া বাটী পাঠাইয়া দিলেন। মধু লাহিড়ী বাবুদিগের বাড়ীর গাড়ীতেই হাবড়ায় গমন করিল। হাবড়া হইতে নয়টার ট্রেনে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। বলা বাহুল্য, এ সময় অম্বিকাবাবু বাটীতে ছিলেন। গুরুদাস বাবু, মধুকে বলিয়া দিয়াছিলেন, সে যেন বাটীতে পৌঁছিয়াই শুভাশুভ সংবাদ লিখে।

যে সময়ে মধু বাটী হইতে রওনা হইয়া যায়, তখন কোন কার্য্যোপলক্ষে রাধিকাবাবুর শ্বশুরবাড়ীর নূতন ঝী রাধিকাবাবুদিগের বাটীতে ছিল। সে বাটীতে যাইয়া নির্ম্মলাকে এই সংবাদ বলিল। নির্ম্মলা এই সংবাদে কান্দিতে লাগিল। ভাহুড়ী মহাশয় নূতন ঝীকে গালি দিয়া এই কথার সত্যতা জানিবার জন্য লাহিড়ী বাটীতে লোক পাঠাইলেন। কথা সত্য জানিয়া, ভাহুড়ী মহাশয় নির্ম্মলাকে অনেক বুঝাইয়া আশ্বস্ত করিলেন। নির্ম্মলা আশ্বাস মানিল না, সে কাঁদিতেই লাগিল। মধু রওনা হইয়া যাইবার তিন ঘণ্টা পরে ভাহুড়ী মহাশয়ের নামে আর এক টেলিগ্রাম আসিল। এ টেলিগ্রাম মধু প্রেরণ করিয়াছে। সে টেলিগ্রামের মর্ম্ম এই :—'মাতার কলেরা হইয়াছে। তাঁহার জীবন সংশয়। দিদিকে পাঠাইয়া দিবেন। শ্যামচাঁদ মামার নিকট টেলিগ্রাম

করিলাম। তিনি নিজে দিদিকে সঙ্গে ক'রে আনিবেন। একজন ঝীও সঙ্গে দিবেন।"

ভাদুড়ী মহাশয় এই টেলিগ্রাম পাইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে শ্যামচাঁদ মামা একখানি সেকেণ্ডক্লাস ছ্যাক্‌রা গাড়ী ভাড়া করিয়া ভাদুড়ী মহাশয়ের নিকট আসিলেন। তিনি নিকটে আসিয়াই একখানি টেলিগ্রাম ভাদুড়ী মহাশয়ের নিকট রাখিলেন। এই তৃতীয় টেলিগ্রামের মর্ম্ম :—"মাতার কলেরা হইয়াছে, তাঁহার জীবন সংশয়, আপনি কলিকাতায় একমাত্র দেশীয় সুহৃদ। একটী ঝী সহ দিদিকে লইয়া শীঘ্র আসিবেন। ষ্টেসনে পাল্‌কি থাকিবে।"

টেলিগ্রাম পড়া শেষ না হইতেই শ্যামচাঁদ বলিলেন, "মধু টেলিগ্রাম করেছে; আমায় যেতেই হচ্ছে, অনেক ক্ষতি হবে, তা কি করি। ছোঁড়ার দেশী আত্মীয় এখানে আর কেহ নাই। আজই আমার হাট-খোলায় তিন হাজার মণ মসিনা, বেলেঘাটায় আড়াই হাজার মণ চাউল এবং চীৎপুরে পৌনে তিন হাজার মণ সরিষা মাপ হবে। কাল আবার টালিগঞ্জে মটরের কাঁটা উঠবে, করি কি, বিষম ক্ষতি, কিন্তু ছোঁড়ারও আর কেহ নাই।"

ভাদুড়ী মহাশয় দুই টেলিগ্রাম পাইয়া গৃহিণীর নিকট গমন করিলেন। গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া নির্ম্মলাকে পাঠান স্থির করিলেন। নির্ম্মলাকে ডাকিয়া তাহারও মত জিজ্ঞাসা করা হইল। নির্ম্মলা যাইবার জন্য বড় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল। তাহার পরে বিবেচ্য বিষয় হইল, নির্ম্মলার সহিত অপর স্ত্রীলোক যাইবে কে? নূতন ঝী নিকটে কার্য্য করিতে ছিল, তাহাকে যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে যাইতে অসম্মত হইল না; কিন্তু বলিল, কুমারটুলীতে তাহার

দিদি আছে, বহুবাজারে মাসী আছে, তাহাদিগকে না জানাইয়া যাইতে পারে না। নির্ম্মলা কাঁদিয়া তাহার হাত জড়াইয়া ধরিল, নির্ম্মলার রোদনে সে বলিল, "দিদিবাবু! তুমি এরূপ কেঁদোনা। আমার আর বলা কহা নাই, চল—এখনি চল।"

ভাদুড়ী মহাশয়ের দ্বিতীয় বিবেচ্য, নির্ম্মলা কিরূপ বেশভূষায় যাইবে। এ বিষয়ে গৃহিণী কোন মত প্রকাশ করিলেন না; নূতন ঝীর মত জিজ্ঞাসা না করিয়া, ভাদুড়ী মহাশয় নিজেই বলিলেন, "গহনার মধ্যে দুই গাছি বালা আর বস্ত্রের মধ্যে দুইখানি মলিন বস্ত্র নির্ম্মলা সঙ্গে লউক। দশটা টাকাও নির্ম্মলার সঙ্গে লওয়া উচিত।"

নির্ম্মলা অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। নূতন ঝী পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া ছিল; শ্যামচাঁদ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। তিন জনেই শকটে আরোহণ করিলেন। শকট দ্রুতবেগে হাবড়া ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিল।

ভাদুড়ী মহাশয় নির্ম্মলাকে পাঠাইয়া দিয়া শ্যামের পকেট হইতে পতিত একখানি পত্র পাইয়া বিষম দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কার্য্যটা ভাল হইল—না মন্দ হইল। তিনি চিন্তাকুল হইয়া গুরুদাস বাবুর নিকট বিশ্বাসী ভৃত্য দ্বারা এই ঘটনা লিখিয়া পাঠাইলেন। গুরুদাস বাবু পত্র পড়িয়াই চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রাধু রাধু! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমি সব বুঝেছি।"

এই চীৎকারে রাধিকাবাবু ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধের নিকট উপনীত হইলেন। বৃদ্ধ আবার কহিলেন, "রাধু! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, মধুর মার কলেরা, মিছে কথা। এ শ্যামচাঁদ ব্যাটার কৌশল। শ্যামচাঁদ হয় নির্ম্মলাকে বে করবে, নয় তার জাত মারবে। তোমার শ্বশুর এক

বোকা, এক নীরেট বোকা। সে গাধার মত কাজ ক’রেছে। সে শ্যামা আর একটা ঝীর সঙ্গে নির্ম্মলাকে পাঠিয়ে দিয়েছে; ঝী তাহার বড় বিশ্বাসী লোক! ক’লকাতার ঝীতে কি না করতে পারে? ঝী না হলেও নয়, এদিকে ঝী সর্ব্বনাশের মূল। তুমি যাও, শীঘ্র যাও, দুই ঘোড়ার গাড়ী ক’রে যাও, খুব শীঘ্র যাবে। যদি হাবড়া ষ্টেশনে তাহাদিগকে পাও, তবে ফিরাইয়া ল’য়ে আসবে। হায়! হায়!! গড়া ঠাকুরাণী বানরী হইতে চলিল। নির্ম্মলা বাঁচিবে না, মরিবে।”

এই কথায় রাধিকাবাবু গাড়ী সাজাইতে যাইবার উপক্রম করিলে, বৃদ্ধ আবার আসিয়া কহিলেন, “না, না, তুমি একা যাইও না। গোপালকে সঙ্গে লও, এই একশত টাকা লও, যদি ষ্টেশনে যাইয়া তাহাদিগকে না পাও, তবে তোমরা পরবর্ত্তী ট্রেনে মেমারী যাবে. মেমারীতে ভাল ক’রে খুঁজবে. শ্যামচাঁদ নির্ম্মলাকে লয়ে কোথায় গিয়াছে। সে ক’লকাতায় থাকতে সাহস পায়নি। আমি শুনেছি, তা’র বাড়ী কালনার নিকটে। গাড়ী ক’রে হ’ক, হেঁটে হ’ক, তার বাড়ী যাবে। সম্ভবতঃ সে বাড়ীই গিয়েছে।”

গোপাল, লাহিড়ী বাবুর বাজার সরকার। গোপালকে গুরুদাস বাবু বলিলেন, “গোপাল! গোপাল! রাধু কখন বাড়ী থেকে বেরোইনি। তোমাকে এ কার্য্যে পাঠালেম. রাধিকা উপলক্ষমাত্র। আমি নিশ্চয় বলছি, তুমি যদি নির্ম্মলাকে ভাল ভাবে ফিরিয়ে আন্তে পার, তা হ’লে আমি সে উপকার কিছুতেই ভুলব না। সাবধান! সাবধান!! যদি পুলিসের সহায়তা লইবার আবশ্যক হয়, তবে লইবে। কিন্তু সহসা পুলিসের সহায়তা লইও না।”

রাধিকা ও গোপাল গাঁড়ী করিয়া নক্ষত্রবেগে হাবড়া ষ্টেশনে গমন করিলেন। বৃদ্ধ গুরুদাস মনের আবেগে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র ভোলানাথ বাবু তাঁহাকে বুঝাইতে আসিয়া বলিলেন, "আপনি না মর্‌তে ভূত হন কেন? যে কার্য্য হ'য়েছে, তাতে ভয়ের কারণ কি? অসম্ভবেরই বা সম্ভাবনা কি? শ্যামচাঁদকেই বা মন্দ লোক কিসে বলেন?"

গুরুদাস। তুমি বোঝ কচু? এও যদি আমি না বুঝ্‌তে পারব. তাহ'লে আর আমায় ক'রে খেতে হ'ত না। পাড়াগেঁয়ে লোকে টেলিগ্রাম করে না। অম্বিকা, কলেজের ছোকরা, সে একটা টেলিগ্রাম করলেও কর্‌তে পারে। আমি কি মধুর বুদ্ধি শুদ্ধি জানিনা? আর সে টেলিগ্রাম কর্‌লে এত শীঘ্র টেলিগ্রাম আস্‌ত না। মধু কথনও শ্যামচাঁদের সঙ্গে নির্ম্মলাকে যেতে বল্‌ত না, আমি তাকে শ্যামচাঁদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিয়েছি, শ্যামচাঁদ ভাল লোকই বা কিসে? দালালী করে, মদ খায়। আমি নিজে তার মুখে মদের গন্ধ পেয়েছি। মধুর সঙ্গে তার কুটুম্বিতাটাই বা কি? যেদিন তাকে নির্ম্মলার সম্বন্ধের কথা বলা হ'য়েছে, সেই দিন হ'তে তার আসা যাওয়া। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর হ'তে কুটুম্বিতার বাড়াবাড়ি। আমি লোকের চলন দেখে মনের ভাব বুঝ্‌তে পারি। এ নিশ্চয় শ্যামচাঁদের কৌশল!

ভোলানাথ। আপনি যদি এতদূর জানেন, তবে আর কি বল্‌বো? আমার বোধ হ'চ্ছে, সত্য সত্যই মধুর মার কলেরা হয়েছে। যা হ'ক, দুই এক দিনের মধ্যেই ঠিক পাওয়া যাবে।

গুরু। দুই তিন দিন পরে সংবাদ পে'লে ত সব হ'ল। সর্ব্বনাশ

হ'লে আর সংবাদ কিসের? নির্ম্মলার জাতিধর্ম্ম গেলে, সেত ম'র্‌বে, আমাদের মনঃকষ্টের ও কলঙ্কের একশেষ হবে!

এই কথোপকথন শুনিয়া রাধিকাবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ বাবু বৃদ্ধের নিকটে আসিয়া কহিলেন, রাধু ও গোপালকে ষ্টেশন মাষ্টার বা রেলওয়ে পুলিস সব-ইনস্পেক্টরকে টেলিগ্রাম ক'রতে ব'ল্লে হ'ত। তাঁহারা শ্যামচাঁদ ও নির্ম্মলাকে আট্‌কালে এরা যেয়ে ষ্টেশনেই পেত।

গুরু। থাম্ ভাই থাম্, তোর আর বুদ্ধি দিতে হবে না। একে যন্ত্রণায় মর্‌ছি, তাহার পর তোরা পরামর্শ দে জ্বালাসনে। আমি আজ কালকের ষ্টেশন মাষ্টারও চিনি, রেলওয়ে পুলিসও চিনি। আমি আর চোর ধর্‌তে ডাকাত নিযুক্ত কর্‌তে পারি না। আমরা কেহই নয়, জাতিধর্ম্ম-রক্ষার কর্ত্তা ভগবান্। মেয়েটার য'দ ধর্ম্মে মতি থাকে, ঈশ্বরই তার জাতি ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বেন। আমাদের যাহা কর্‌তে হয়, হরি যাহা ভাল বুঝালেন, তাই কর্‌লুম।
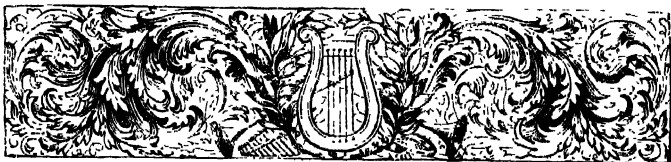
চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মলার বিপদ।

বিপদ সম্পদ দুইটী শব্দ আছে। স্থূলজ্ঞানে পার্থিব দৃষ্টিতে এই দুয়ে প্রভেদ বড়। ধার্ম্মিকের পক্ষে, আস্তিকের নেত্রে সম্পদ-বিপদ এক। স্বর্ণ অগ্নিতে যতবার দগ্ধ হয়, তাহার বিশুদ্ধতা ও ঔজ্জ্বল্য ততই বাড়িতে থাকে। বস্ত্র যতবার ক্ষার সংযোগে সিদ্ধ হয়, যত অধিক প্রহারের উপর প্রহার প্রাপ্ত হয়, ততই তাহার পরিচ্ছন্নতার বৃদ্ধি হয়। লৌহ যত অধিকবার দগ্ধ হয় ও যত অধিকবার পিষ্ট হয়, ততই তাহার গুণাধিক্য হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক যত অধিক বার বিপদের সম্মুখীন হইয়া বিপত্তাড়নে উৎপ্লুত হন, ততই তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, ততই তাঁহার ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়, ততই তাঁহার করুণাময় গুণময়ের গুণ প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে। করুণাময় ঈশ্বর বিপদের

রঙ্গমঞ্চে ধার্ম্মিককে আলিঙ্গন করিতে যতবার অগ্রসর হন, সম্পদের রঙ্গমঞ্চে অধাম্মিককে তিনি বিলাসের হট্টে রাখিলেও, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে কখন অগ্রসর হন না। তাই বলি, ধর্ম্মশীলের পক্ষে বিপদই ভাল।

একটার গাড়ীতে হাবড়া হইতে রওনা হইয়া নির্ম্মলা, শ্যামচাঁদ ও নূতন ঝী, দুইটা কয়েক মিনিটের সময়ে মেমারী ষ্টেশনে রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মেমারী ষ্টেশনে বাস্তবিক শিবিকা ছিল। নির্ম্মলা ও নূতন ঝী শিবিকায় আরোহণ করিলেন। শিবিকায় আরোহণের সময় নির্ম্মলা শ্যামচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, আমরা ত পাল্কিতে চলিলাম; আপনি কিসে যাইবেন?"

শ্যামচাঁদ উত্তর করিলেন, "আমি হেঁটেই যাব। আমি হাঁট্‌তেও মজ্‌বুত আছি।"

নির্ম্মলা ও নূতন ঝী শিবিকায় উঠিবামাত্র শিবিকার দ্বার রোধ করা হইল। শিবিকা পশ্চিম দিকে দ্রুতবেগে যাইতে লাগিল। নির্ম্মলা প্রতি মুহূর্ত্তে পীড়িতা মাতাকে দেখিবার আশা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে কত চিন্তার উদয় হইতে লাগিল।

বেলা প্রায় ৪৷৷০ টার সময় নির্ম্মলা মনে করিতে লাগিলেন, শিবিকা কোন পল্লী মধ্যে আসিয়াছে। শিবিকার দুই পার্শ্বে অনেক লোকের কথা শুনা যাইতে লাগিল। পরিশেষে শিবিকার বেগ কিছু থামিল, বোধ হইল, কোন বাটীর নিকট শিবিকা আসিয়াছে। তথায় অনেক লোকে কথা কহিতেছেন। শিবিকার নিকটে কতকগুলি বালক-বালিকা আছে বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল। অতঃপর শিবিকা এক গৃহস্থের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শিবিকা নামান হইলে, নূতন

ঝা শিবিকার দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। নির্ম্মলা শিবিকার মধ্য হইতে চাহিয়া দেখিলেন, এ এক গৃহস্থের অন্তঃপুর। তিনি দেখিলেন, তিন দিকে বড় বড় খড়ের ঘর। পূর্ব্বদিকে একটা বৃহৎ নূতন দালান। "এ কোথায় আসিলাম, কোন্ বাড়ীতে আসিলাম, কেন শিবিকা নামান হইল" এই চিন্তায় নির্ম্মলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নির্ম্মলা, নূতন ঝা ও শ্যামচাঁদ মামার কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কয়েকটী স্ত্রীলোক আসিয়া নির্ম্মলাকে শিবিকা হইতে নামাইয়া লইয়া, পূর্ব্ব পোতার দালানের সর্ব্ব উত্তরের কামরায় মাদুর আসনে উপবেশন করাইলেন। নানা চিন্তায় নির্ম্মলা অবগুণ্ঠনবতা হইয়াছিলেন। বামাকুল তাঁহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহার মুখ দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছিলেন তাঁহারা মুখ দেখিয়া কেহ বেশ মেয়ে, কেহ বেশ বধূ বলিয়া চলিয়া গেলেন। নির্ম্মলা যে গৃহে থাকিলেন, সে গৃহের দ্বারে শিকল দেওয়া হইল। এখন নির্ম্মলা বুঝিতে পারিলেন, তিনি কোন ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি পিতৃ-উপদেশ স্মরণ করিয়া অগতির গতি হরিকে ডাকিতে লাগিলেন।

নির্ম্মলার নিকটে মনোরমা নাম্নী একটি অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা ছিল। বালিকা নির্ম্মলার সহিত কথা কহিবার জন্য বড় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল। নির্ম্মলাও কি বিপদে পড়িয়াছেন জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। মনোরমা বলিল, "তুমি আমার খুড়ীমা হবে, তুমি আমার সঙ্গে কথা কও। আমি সব সময় তোমার কাছে থাকব। আমি পিসীমা অপেক্ষা তোমার বেশী বাধ্য হব।" নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মা, আমি যদি তোমার খুড়ীমা হই, তবে কোন্ খুড়ী হইব?"

মনোরমা। আর হই কেন, খুড়ী হবেই হবে? এই সন্ধ্যার পরেইত বে হবে।

নির্ম্মলা। তোমার খুড়ার নাম কি?

মনোরমা। এত বড় মেয়ে, আঃ পোড়া কপাল, এখনও খুড়ার নামটা শোন নাই। আমার খুড়ার নাম শ্যামচাঁদ বিশ্বাস। ইনি কল্‌কাতার দালাল। খুব গহনা পাবে, আমার খুড়ীমার অনেক গহনা ও কাপড় চোপড় আছে।

নির্ম্মলা এখন বুঝিতে পারিলেন, শ্যামচাঁদ তাঁহাকে বাড়ী আনিয়াছে, শ্যামচাঁদ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবে। তাঁহার মায়ের পীড়ার সংবাদ হয়ত মিথ্যা সংবাদ। টেলিগ্রামগুলি শ্যামচাঁদের কৌশল। নূতন ঝী শ্যামচাঁদের চর। নূতন ঝী অনেক সময়ে শ্যামচাঁদের প্রশংসা করিয়াছে, শ্যামচাঁদ খুব উপার্জ্জনশীল বলিয়াছে, শ্যামচাঁদ বেশ সঙ্গতিপন্ন তাহাও জানাইয়াছে। নির্ম্মলার এখন আর সহায় কে? অসহায়ের সহায় হরি—নির্ম্মলার এখন একমাত্র সহায়। নির্ম্মলা একান্ত মনে হরিকে ডাকিতে লাগিলেন, "হরি! অবলার ক্রন্দনে কর্ণপাত কর।"

নির্ম্মলা যে প্রকোষ্ঠে ছিলেন, তাহার দ্বার জানালাগুলি সব বন্ধ ছিল। দিন কি রাত্রি নির্ম্মলা ঠিক পাইতেছিলেন না। যে বালিকাটী তাঁহার নিকটে ছিল, সে কিছুক্ষণ পরে তাহার পিসীমাকে ডাকিয়া শিকল খুলাইয়া বাহির হইয়া গেল; নির্ম্মলা একাকিনী বন্দিনী হইয়া থাকিলেন। তিনি বাহিরে বহুলোকের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইতেছিলেন।

পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে আকাশে মেঘ উঠিল। অল্প ক্ষণের মধ্যে উহা ঘনীভূত হইল; সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইল; সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ করকাপাতের সহিত মুষলধারে বৃষ্টি নামিল।

শ্যামচাঁদের দালানটী নূতন। দালানের একতল ও দ্বিতল সম্পূর্ণ সারা হইয়াছে, দ্বিতলের উপরের চিলা কুঠরী সারা হয় নাই। আজ গণক বা জ্যোতিষীর গণিত পঞ্চম দিন। শ্যামচাঁদের জ্যোতিষীর গণনার কথা কিছুমাত্র মনে ছিল না।

কালনার বাজারের ঠাকুরদাস দাস বণিক শ্যামচাঁদের বাড়ীর ক্রিয়া-কর্ম্মে ময়দা, ঘৃত, চিনি, বস্ত্র, মসলা ইত্যাদি দিতেন। তিনি অদ্য বৃষ্টির পূর্ব্বে এক গরুর গাড়ীতে করিয়া ময়দা, চিনি, ঘৃত, বস্ত্রাদি লইয়া শ্যামচাঁদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তিনিও বৃষ্টিতে আবদ্ধ হইয়া শ্যামচাঁদের বৈঠকখানায় ছিলেন।

নির্ম্মলা যে গৃহে ছিলেন, সেই গৃহে সন্ধ্যার সময় একটা দীপ দেওয়া হইয়াছিল। নির্ম্মলা প্রায় সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া হরিকে ডাকিতেছিলেন, আর প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাকে বিবাহস্থলে শ্যামচাঁদের পার্শ্বে লওয়া হইবে, এই আশঙ্কা করিতেছিলেন।

ঝড় বৃষ্টির সময়ে একটা শব্দ হইয়াছিল। শ্যামচাঁদের নূতন দালানটী যেন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ঝড় বৃষ্টির সময়ে কোন্ দিকে কিসের শব্দ লোকে ঠিক করিতে পারে নাই। রাত্রি আটটা বাজিল। পুরোহিত ঠাকুর বিবাহের স্থান করিতে বলিলেন। প্রাচীন লোকেরা লগ্ন সরিয়া যায় বলিয়া গোল উঠাইলেন। তখন শ্যামচাঁদের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। বাড়ীর সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না। একটী বধূ কহিলেন, শ্যামচাঁদকে আলো লইয়া চিলা কুঠরীর দিকে যাইতে দেখিয়াছি। তখন চারি পাঁচ জন দীপ লইয়া চিলা কুঠরীতে উঠিলেন।

কি ভয়ানক ব্যাপার! শ্যামচাঁদ গোঙ্গাইতেছেন। ঝড় বৃষ্টির সময়

শ্যামচাঁদ কোনও ভৃত্যকে নিকটে পাইলেন না। তাঁহার মনে পড়িল, চিলা কোঠায় কয়েক মণ চূণ অনাবৃত অবস্থায় আছে; তিনি নিজেই দীপ হস্তে করিয়া চূণ ঢাকিতে গেলেন। চিলা কোঠায় গিয়া দরমা ধরিয়া যেমন টান দিলেন, অমনি সেই আকর্ষণে চিলা কোঠার উপরিস্থ দুইটা কড়িকাঠ ও তদুপরিস্থ টালিগুলি তাহার মস্তকোপরি পড়িয়া গেল। সকলে গিয়া দেখেন, সর্ব্বনাশ! শ্যামচাঁদের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, বুকের হাড় ভাঙ্গিয়াছে, রক্তে শরীর প্লাবিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাণবায়ু এখনও বহির্গত হয় নাই।

চিলা কোঠায় বিষম গোল উঠিল। সকল লোক সেই দিকে ধাবিত হইল। বৃদ্ধ বণিক ঠাকুরদাসও বৈঠকখানা হইতে চিলা কোঠায় যাইবেন বলিয়া দালানে আসিলেন। দালানের প্রথম তলে দীপমাত্র ছিল না। বৃদ্ধ বণিক দ্বারের শিকল খুলিয়া নির্ম্মলা যে গৃহে ছিল, সেই গৃহে প্রবেশ করিল, এবং কোন্ ঘরে যাইতে কোন্ ঘরে আসিয়াছে বলিয়া অপ্রতিভ হইল। কিন্তু নির্ম্মলা ঠাকুরদাসকে দেখিয়া স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইল। বৃদ্ধ ঘর হইতে বাহির হইতেছে, এমন সময় নির্ম্মলা তাহার পদযুগল ধারণ করিয়া বলিল, "বাবা যাইবেন না, আপনি আমাকে চেনেন নাই আমি আপনাকে চিনিয়াছি। আমি আপনার নির্ম্মলা। আমার জাতি যায়, আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কুড়ে শ্যামচাঁদ সম্পর্কে আমার মামা হয়। নির্ব্বংশের বেটা চুরি ক'রে আমাকে "বে" করতে এনেছে। বাবা আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন আমাকে রক্ষা করবার আর কেহ নাই।" এই বলিয়া নির্ম্মলা কাঁদিতে লাগিল।

ঠাকুরদাস বলিলেন, "চুপ কর মা, চুপ কর। আমি তোমার উদ্ধারের উপায় দেখিতেছি।"

বণিক এই কথা বলিয়া ঘরের শিকল আবার আঁটিয়া দিয়া তাহার সেই গরুর গাড়ীর নিকট গেল।

গাড়োয়ানকে চুপে চুপে ডাকিয়া বলিল, গাড়ী ঠিক কর। গাড়োয়ানও সে সময় বাড়ী যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। গরু জুড়িয়া গাড়ী ঠিক করা হইলে, ঠাকুরদাস নির্ম্মলার নিকট ফিরিয়া আসিল এবং শিকল খুলিয়া কহিল, "এস মা এস, চুপে চুপে এস।" অন্ধকারে বণিক নির্ম্মলার হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইল। নিজেও গাড়ীতে বসিল। গাড়ী ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করিতে করিতে বণিকের বাটীর দিকে চলিল।

এ সময়ে বৃষ্টি থামিয়াছিল, কিন্তু রাত্রি বড় অন্ধকারময়া ছিল। শ্যামচাঁদের বাড়ীতে গোল উঠিয়াছিল। সকল লোক দ্বিতলে ও চিলা কোঠায় উঠিয়াছিল, শ্যামচাঁদকে সেই কড়ীকাঠ ও টালীর মধ্য হইতে বাহির করা হইল, তাঁহাকে সযত্নে দ্বিতলে আনা হইল। তাঁহার ক্ষত স্থানের রক্তবন্ধের চেষ্টা হইতে লাগিল। চারিদিকে ডাক্তার কবিরাজ আনিতে লোক ছুটিল। বিবাহের আনন্দরোল হাহাকারে পরিণত হইল। নির্ম্মলার অনুসন্ধান আর কেহ করিল না। নির্ম্মলা নিরাপদে ঠাকুরদাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

শ্যামচাঁদ মৃত্যুশয্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন; কবিরাজগণ আসিয়া শ্যামচাঁদকে কোন ঔষধই দিলেন না। ডাক্তারগণ আসিয়াও কোন আশাপ্রদ কথা বলিলেন না। ডাক্তারেরা কেবল রক্তস্রাব বন্ধ করিবার ও বলকারক ঔষধে শ্যামচাঁদের একটু বলাধানের চেষ্টা করিলেন। শ্যামচাঁদের এক বড় ভাই ও এক ভগ্নী ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মলার কলিকাতায় গমন।

মানব! তুমি কি করিতে পার? তোমার মন আছে, তুমি একটী কর্ম্ম মনস্থ করিতে পার। সিদ্ধি অসিদ্ধি কি তোমার সাধ্যায়ত্ত? তোমার কোন সাধ্যই নাই। তুমি বিধাতার হাতের যষ্টি। তিনি যেভাবে চালান, সেইভাবেই চল। তুমি আশা করিতেছ, এ কর্ম্ম করিবে, সে কর্ম্ম করিবে, পণ্ডিত হইবে, বড়লোক হইবে। বল দেখি তোমার কয়টী আশা, কয়টী অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে? তোমার কি যত্ন চেষ্টার ত্রুটি আছে? ঈশ্বর যাহা করান, তাহাই কর, তোমার নিরন্তর চিন্তাশীল কল্পনাপ্রিয় মন তোমাকে নিয়ত কতই সুখের স্বপ্ন দেখায়! তোমার ন্যায় সকলেই আশা গড়ে, ভাঙ্গে, সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া

বিফল-মনোরথ হয়। ভাবিয়া দেখ, কত অভিপ্রায় সিদ্ধির চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়াছ। রাধু ও গোপাল দুইজনে যে চলিয়াছে, তাহাদের নির্ম্মলা উদ্ধারের ক্ষমতা এমন কি আছে? সে শক্তি দৈব-শক্তি। নির্ম্মলা উদ্ধারের যোগ্যা পাইলে উদ্ধার হইবে, নচেৎ রাধু ও গোপালের শ্রম পণ্ডশ্রম হইবে।

রাধিকাবাবু ও গোপাল চক্রবর্ত্তী সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে মেমারী ষ্টেশনে নামিয়াছিলেন। তাঁহারা ষ্টেশনে নামিয়া একখানা শিবিকা কোন্ দিকে গিয়াছে, অথবা নূতন ঝী নির্ম্মলা ও শ্যামচাঁদ কোন্‌দিকে গিয়াছে এই সংবাদ সংগ্রহ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়াছিল। তাহার পরেই ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহারা সে রাত্রিতে এক পাও কোন দিকে যাইতে পারেন নাই।

মধু বাড়ী গিয়া মাতাকে সবল ও সুস্থ শরীরে দেখিল। সে মাতাকে টেলিগ্রাফ করার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিল। মহামায়া কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না। মধু অম্বিকা বাবুকে টেলিগ্রাফের বিবরণ বলিলে, তিনি শুনিয়া চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন। মহামায়া, অম্বিকাবাবু ও মধু তিনজনে একসঙ্গে বসিয়া স্থির করিলেন যে, টেলি-গ্রাফ করা কোন দুষ্টের কার্য্য। এ কোন সর্ব্বনাশের অভিসন্ধি। নির্ম্মলা অবিবাহিতা, বয়স্থা কন্যা, টেলিগ্রাফ করাইয়া মধুকে সরাইয়া দিয়া তাহার প্রতি বা কোন অন্যায় আচরণ হয়, এ সন্দেহ মহামায়া ও অম্বিকাবাবুর মনে আসিল। তাঁহারা মধুর বাটীতে ক্ষণকালও বিলম্ব করা উচিত নয়, স্থির করিলেন। সন্ধ্যাকালে ঝড় বৃষ্টির জন্য মধু বাহির হইতে পারিল না। অন্ধকার রাত্রি বলিয়া গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান দুই প্রহর রাত্রি মধ্যে গাড়ী ছাড়িল না। মধু রাত্রি দুই প্রহরের পর গাড়ী

করিয়া মেমারী অভিমুখে যাত্রা করিল। পরদিন প্রাতঃকালে বেলা প্রায় ৮টার সময় কালনার বাজারের মধ্যে মধুর গাড়ী রাধিকাবাবুর গাড়ীর সম্মুখীন হইল। মধু রাধিকাবাবুকে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখানে কি জন্যে?"

রাধিকা। "বড় বিপদ, ভারী সর্ব্বনাশ! শ্যামচাঁদ কৌশলে নির্ম্মলাকে লইয়া আসিয়াছে, তোমার মার পীড়া বোধ হয় মিথ্যা কথা।"

মধু। মার পীড়া মিথ্যা কথা। আমরাও অনুমান করেছি, কোন বিপদ ঘটিবে। প্রথম টেলিগ্রাফও শ্যামচাঁদের কৌশল।

এই কথোপকথনের পর তিন জনেই গাড়ী ছাড়িয়া হাঁটিয়া দ্রুতবেগে শ্যামচাঁদের বাটীর দিকে চলিলেন। শ্যামচাঁদের বাড়ী কালনার বাজার হইতে এক ক্রোশ দূরে উত্তর দিকে অবস্থিত। পথিমধ্যে রাধিকা, গোপাল ও মধুতে আর আর সকল কথা হইল। বেলা ৯টার মধ্যে তিনজনেই শ্যামচাঁদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে শ্যামচাঁদের জ্ঞান ছিল না। সে উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছিল। তাহার বিষম জ্বর হইয়াছিল তাহার ক্ষতস্থান দিয়া শোণিতপাত হইতেছিল। ডাক্তারেরা তাহাকে নানা ঔষধ সেবন করাইতেছিলেন। কিছুতেই তাহার জ্ঞান হয় নাই। সে সবলে কথা বলিতেছিল। ক্ষতস্থান সকল হইতে শোণিতধারা প্রবলতরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল।

রাধিকা বাবুরা পথিমধ্যে জানিয়াছিলেন, কলিকাতা হইতে আনীত কন্যার সহিত শ্যামের বিবাহ হয় নাই। শ্যামচাঁদ চাপা পড়ায় মুমূর্ষু অবস্থায় আছে। শ্যামের বাড়ী কত লোক যাইতেছিল; রাধিকাবাবুরা শ্যামের বাড়ী উপস্থিত হইলে ভৃত্যেরা তাঁহাদিগকে শ্যামচাঁদের কাছে

লইয়া গেল। শ্যামচাঁদ সহস্র পাপী হউক, তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা দুঃখিত হইলেন।

রাধিকাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামবাবু! আমাকে চিনিতে পারেন কি?"

শ্যামচাঁদ। চিনিব না কেন, চিনেছি; তুমি স্বয়ং যম। (গোপালের প্রতি) তুমি যমদূত; (মধুর প্রতি) তুমি পুরোহিত ঠাকুর; কৈ কৈ, নূতন ঝী কৈ? সে যে আমার এ কাজের কাণ্ডারী। নূতন ঝী! নির্ম্মলা কি আমার বাধ্য হবে না? ঐ যে নির্ম্মলা এই দিকে আসছে। নির্ম্মলা! তুমি আমাকে এত গাল দিচ্ছ কেন? এত চোক রাঙাচ্ছ কেন? তোমাকে যে সকলে লক্ষ্মী মেয়ে বলে। না—না, নির্ম্মলা ঐ যে হাসছে। নির্ম্মলা! তোমার এত কোপ কেন? পুরুতঠাকুর! মন্ত্র পড়াও। না—না—না, বে হ'লো না। ঐ যে পুলিশ আসচে,—ও না যমদূত? আমি কোথায় যাই? যমদূত! মেরো না মেরো না; আমি বড় পাপী। গণক ঠাকুর! তুমি আমার প্রতি বন্দুক ধরিলে কেন? ওরে বাবা মরেছি। (অতি উচ্চ-রবে) নির্ম্মলা! নির্ম্মলা! তুমি উলঙ্গিনী হয়ে, অসি করে লয়ে, ভীমাবেশে আমার দিকে আসছ! তুমি নির্ম্মলা, না চতুর্ভুজা আলুলায়িতকেশা দিগম্বরী কালী? না—না—না, আমার মাথা কেটে লইও না—তাই লবে। ওরে বাবা, তবে যাই কোথা?

শ্যামচাঁদের প্রলাপ শুনিয়াও রাধিকাবাবুদের শোণিত উত্তপ্ত হইতে-ছিল। ঘৃণায় মুখ ভ্রূভঙ্গি-সমন্বিত হইতেছিল। নূতন ঝী রাধিকাবাবু-দিগের পরিচয় দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাঁহাদের পরিচয় শুনিয়া শ্যামচাঁদের পরিবারস্থ সকলে ভীত হইয়াছিল। শ্যামচাঁদের বাড়ীর

প্রত্যেক গৃহে ও গ্রামের সকল বাটীতে নির্ম্মলার অনুসন্ধান হইতেছিল। কোথাও তাহাকে পাওয়া যায় নাই। শ্যামের দাদা ও ভগ্নী, রাধিকা ও গোপালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমাদের বিপদ দেখিতেছেন? আমরা কোন দোষের দোষী নহি। যত পাপ শ্যামের। নূতন ঝী মাসী সাজিয়া নির্ম্মলাকে আনিয়াছে; আপনাদের আগমনে সে ভয় পাইয়া সত্য কথা বলিয়া পলাইয়াছে। নির্ম্মলাকে আমরা কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না।"

এই কথা শ্রবণে রাধিকা বাবুরা তিনজনে ও গ্রামের মান্য গণ্য কয়েক ব্যক্তি নির্ম্মলার বহু অন্বেষণ করিলেন; কোথাও পাইলেন না। তাঁহারা নিঃসংশয়রূপে জানিলেন, নির্ম্মলা সে গ্রামে নাই। বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময় তাঁহারা হতাশ হইয়া কালনার বাজার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন গ্রাম হইতে বহির্গত হন, তখন শুনিলেন শ্যামের জীবন বায়ু বহির্গত হইয়াছে।

তাহারা কালনার বাজারে আসিবার রাস্তার দুই পার্শ্বের গ্রামে নির্ম্মলার অনুসন্ধান করিলেন। একটী বৃদ্ধ কৃষক বলিল, "কল্য রাত প্রায় ছয় দণ্ডের সময় ঝড়বৃষ্টি থামলে ঐ গ্রাম হ'তে একখানা গাড়ী আমাদের গ্রামে ঠাকুর দাস বেণের বাড়ীতে এসেছে। সে গাড়ীতে একটী মেয়ে এসেছে, আমি শুনেছি।" এই অনুসন্ধান পাইয়া তাঁহারা ঠাকুরদাস বণিকের বাটীতে গেলেন। ঠাকুরদাস মধুর কালনার বাজারের পূর্ব্বপ্রভু। ঠাকুরদাস একখানা চৌকীর নিকট তৈল লইয়া মাখিবার উপক্রম করিতেছিলেন; এমন সময়ে তাঁহারা তিনজন ঠাকুরদাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সহসা তিনটী ভদ্রলোককে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তিনি বসিবার আসন দিলেন। মধু বণিককে

ভক্তিভাবে প্রণাম করিল, বণিক ব্যস্তভাবে বলিলেন, অঁ্যা, অঁ্যা, আপনি! করেন কি? করেন কি? আপনি—প্রণাম—আমি বেণে।

মধু বলিল, "আমি আপনার প্রতিপালিত মধুদত্ত।" তখন বণিক চক্ষের জল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "বাবা এসেছ, আমি বাচলেম। নির্ম্মলাকে ল'য়ে আমি বড় দুশ্চিন্তায় প'ড়েছিলাম। কা'ল রাক্ষসের গ্রাস হ'তে তাকে এনেছি। আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, আমার সর্ব্বস্বান্ত হ'লেও মাকে ছেড়ে দিব না।"

এই কথা হইতে না হইতে নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগের নিকট আসিল। পরস্পরের কত কথা হইল। বিপদের পর, ক্লেশের পর, ভাল সময় আসিলে, আত্মীয়ের সহিত দেখা হইলে যেরূপ পরস্পরের মনে আনন্দ হয়, সেইরূপ হইল। রাধিকা ও গোপাল ঠাকুরদাসকে সহস্র ধন্যবাদ ও লক্ষ প্রশংসা করিলেন।

সকলে মধ্যাহ্নে বণিকের বাটীতে আহার করিলেন। আহারান্তে বণিক দুইখানি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া দিলেন। সেই গাড়ীতে তাঁহারা মেমারি ষ্টেশনে আসিলেন। সেই রাত্রিতে তাঁহারা সকলে কলিকাতায় নিরাপদে উপনীত হইলেন। নির্ম্মলার বিপদ অতীত হইল। মহামায়া বাটীতে সংবাদ পাইলেন, অন্য কোন বিপদ ঘটে নাই, কেবল মিথ্যা টেলিগ্রাফ কে করিয়াছিল, তাহার নির্ণয় হইল না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

মধুর বিপদ।

যুবক, ঐ যে বিলাসভবনের সম্মুখস্থিত কুসুম-কাননে প্রভাতী মলয়ানিলবিকম্পিত ভ্রমরচুম্বিত বিকসিত সুগন্ধময় গোলাপ দেখিতেছ, ঐ গোলাপ দেখিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়া চঞ্চলতা-বিহ্বলচিত্তে তুলিতে যাইও না। ঐ যে রাজবর্ত্ম-পার্শ্বস্থ কৃষ্ণবর্ণ বিশাল বিষধর সর্প লোল রসনায় ফণা বিস্তারপূর্ব্বক তোমার দিকে সবেগে ধাবিত হইতেছে, তাহাকে দেখিয়াও ভয়ে বিহ্বল হইয়া রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াইও না। যে গোলাপকে সুখের আকর, বিলাসের সম্পদ ভাবিতেছ, সেও তোমার পক্ষে সম্পদ না হইতে পারে আর যে বিষধর ভুজঙ্গকে বিপদ মনে করিতেছ, সেও তোমার পক্ষে বিপদ না হইতে পারে। বিপদ সম্পদ যাহাই সম্মুখীন হউক না কেন, তাহার সম্মুখে প্রকৃত বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতে হইবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া, জ্ঞান বুদ্ধিতে যাহা আসিবে, তাহাই ধীর স্থিরচিত্তে করিবে।

মধু কলিকাতায় আসিয়া জানিলেন, তিনি যে পাঁচশত টাকার নোট পাইয়াছেন, সে নোট টালার জগচ্চন্দ্র বসুর। তিনি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাঁহার অপহৃত নোট যে তাঁহাকে দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে একশত টাকা পুরস্কার দিবেন। মধু এই সংবাদ পাইয়া স্থির করিলেন, আগামী দিনে স্কুলের পরে নোট দিতে যাইবেন। পরদিন শনিবার ছিল।

২৮শে ফাল্গুন শনিবার বেলা আড়াইটা হইয়াছে। কলিকাতায় বিষম গরম পড়িয়াছে। প্রবল বায়ু বহিতেছে। রাস্তায় ধূলি উড়িয়া পথের পথিকের বস্ত্র মলিন করিতেছে, দোকানের মিঠাই অখাদ্য করিতেছে। কাকগুলি গরমে অধিকতর কা কা করিতেছে। ছ্যাকরা গাড়ীগুলি অধিকতর খ্যাং খ্যাং করিয়া ছুটিতেছে। তাহার ঘোড়াগুলি রৌদ্রে মাথা হেঁট করিয়া দৌড়িতেছে। রাস্তায় অতি অল্প লোক চলিতেছে। মধু এমন সময়ে কোঁচার মুড়ায় নোট বাঁধিয়া টালার জগচ্চন্দ্র বসুর নিকট গমন করিলেন।

মধু বাগবাজার পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতে পিপাসায় বড় কাতর হইলেন। তিনি এক মিঠাইয়ের দোকানে জল খাইতে গেলেন। মিঠাইকর ঠাকুর একটা ঘটীতে করিয়া তাঁহাকে জল পান করিতে দিলেন। ঘটীর জল মুখে ঢালিবার সময় গাত্র গড়াইয়া কোঁচার মুড়া ভিজিয়া গেলে মধু কোঁচার গিরে খুলিয়া নোটের তাড়া বাহির করিয়া ফেলিলেন।

সেই মিঠাইয়ের দোকানের অনতিদূরে একটী গ্যাসস্তম্ভ ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া এক পাহারাওয়ালাপ্রভু ঝিমাইতেছিল। সে মধুর হাতে নোট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেত্‌না রোপেয়াকা নোট?"

মধু। পাঁচশ টাকার।

পা। কেস্‌কো নোট?

মধু। টালার জগৎ বসু মহাশয়ের নোট।

পা। তোম্ কাঁহা পায়া?

মধু। আমি আমার দোকান ঘরে পেয়েছি।

পা। নেই, নেই, ঝুট্টা বাত্। তোম্ চুরি কিয়া। তোম্ চোর হ্যায়। (এই বলিয়া এক হাতে নোট কাড়িয়া লইয়া অপর হাতে মধুর হাত ধরিয়া) চল, থানামে চল, (মিঠাইকর ঠাকুরের প্রতি) ঠাকুর! তোম দেখা হ্যায়, হাম কেসমাপিক করকে চোর পাকড় কিয়া?

মিঠাইকর ঠাকুর। আমি চোর কিসে জানি। ভদ্রলোকের ছেলে জল খেতে এসেছেন, তুমি চোর বলে ধর্‌লে। জগৎ বসু কে, তাঁকেও চিনি না, উনি তাঁর কে, তাও জানি না।

এই কথার পরে পাহারাওয়ালা আসিয়া মিঠাইকর ঠাকুরের সহিত চুপে চুপে কি বলিল। পরে বড় করিয়া বলিল। "মেরা বাত্ সম্‌জে? হাম দোসরাবার দেখা করেঙ্গে।"

এই কথা বলিয়া পাহারাওয়ালা মধুকে থানায় লইয়া চলিল। মধুর সহস্র অনুনয় বিনয় ব্যর্থ হইল। থানায় দারোগার নিকট রোদনেও কোন ফল হইল না। শনিবার অপরাহ্নে জেলে লোক লয় না। রবিবারেও জেলে কয়েদী পাঠাইবার নিয়ম নাই; সোমবারে থানা হইতে মধু প্রেসিডেন্‌সি জেলে প্রেরিত হইলেন; মঙ্গলবারে তাঁহার চুরি অপরাধের বিচারের দিন ধার্য্য হইল। মধু কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোক ফুলাইয়া ফেলিলেন।

নির্দ্দোষ মধু কেন জেলে আসিলেন? ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়

কে বুঝিবে? পাঠক পাঠিকা অবশ্য বলিবেন, এ ঈশ্বরের অন্যায় অত্যাচার। এ কথায় আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। তিনি মঙ্গলময়; তাঁহার কার্য্যও মঙ্গলময়। নিষ্পাপজনের ক্লেশও অবশ্যই কোন মঙ্গলের জন্য হইয়াছে।

মধু জেলে বসিয়া কান্দিতেছেন, এমন সময় দুই জন লোকের কথায় তার মন আকৃষ্ট হইল।

প্রথম ব্যক্তি কহিল, নবীন, নবীন আমার মুঠার মধ্যে। আমায় এই দণ্ড দিলে আমি তাঁর সর্ব্বনাশ করিব।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সাধে সাধে জামিন হও। আমি ত মরি তোমার পাপে।

প্রথম। আজই কেশব টাকা দিবে। আজই খালাস হইতে পা'রবে।

দ্বিতীয় খালাস যেন হ'লুম, এ দণ্ড, এ ব্যাকুব শেলামী দেই কেন?

প্রথম। আমি যার জামিন হয়েছি, সে কম লোক নয়। সে একটা রাজা। আজকাল একটা মামলায় বেধে আছে, তাই টাকা আসছে না; টাকা এল বলে, কেশব গ্যাছে, সে নিশ্চয় টাকা আনবে।

দ্বিতীয়। নবীন এরূপ করে কেন?

প্রথম। সেই শশীর উইল।

দ্বিতীয়। দেওনা কেন ওকে? নবীনত টাকাও কবুল কচ্ছে।

প্রথম। ওকে আর দিচ্ছি না—নবীন জুয়াচুরিটা খেলেছে কি তা জান?

দ্বিতীয়। জানি বই কি, নবীন ভারি চতুর। শশী টাকা লইয়া গুরুদাস লাহিড়ীকে বাটীগুলি কবলা করিয়া দিল; নবীন তাহার পূর্ব্বের

তারিখ দিয়া কবলা লেখাইয়া পরে রেজেষ্ট্রী করেছে। গুরুদাস লাহিড়ী মোট জায়গাটার পরিচয় দিয়েছে, আর নবীন প্রত্যেক বাড়ীর স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে। কতকগুলি বাড়ীর যে দুই কবলা হলো, রেজেষ্ট্রী আফিসে তা ধরতেই পারে নি। শশী নাকি এখন নবীনের বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে আছে।

প্রথম। হাঁ, এই কথা। নবীন আমাকে কেমন ব্যাকুবটাই করেছে। গুরুদাস লাহিড়ী বামন, ভালমানুষ, আমার কথায় বায়ান্ন হাজার টাকা দিলে; এখন নবীন তাকে একখানা বাড়ীও দেয় না। নবীনের দাদা উমেশের সহিত শশীর বিবাদ হলে শশীর কলেরা হয়। আমি শশীর অনেক যত্ন করি। শশী বাড়ীগুলি আমাকে উইল ক'রে দেয়, উইলে অনেক বড় বড় ডাক্তার সাক্ষী আছে। এই উইলবলে আমি যদি বাড়ী ধরতে যাই, তা হইলেই শশী বেরুবে, শশী বেরুলেই গুরুদাস লাহিড়ী তার নামে ফৌজদারী কেস করিতে পারবে। এই উইলের কথা আমি এতদিন প্রকাশ করি নাই, আমার ইচ্ছা ছিল, লাহিড়ীতে আর নবীনেতে রফা করে। লাহিড়ী বাড়ীগুলি অল্পমূল্যে পেয়েছে এবং নবীনের পৈতৃক টাকায় উমেশের বুদ্ধির দোষে শশী পেয়ারুয়ের নামে বিষয় করেছে।

দ্বিতীয়। নবীন খুব চালাক ছেলে।

প্রথম। চালাক বটে, কিন্তু আমাদের জেলে আনা তার ব্যাকুবি হয়েছে। সে আর মানুষ চিন্‌লে কৈ?

এই কথোপকথনের পর মধু জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের নাম কি?"

প্রথম। আমার নাম শ্যামাচরণ ঘোষ, আর ইঁহার নাম কৃষ্ণবিহারী বসু।

মধু। আপনাদের নিবাস?

দ্বিতীয়। আমাদের নিবাস টিবাসে কি কর্‌বে? আমাদের বাড়ী কলিকাতায় নয়; তবে থাকি জোড়াবাগানে।

মধু। আপনাদের কি করা হয়?

প্রথম। আমি দালালী করি, আর উনি মুটের সর্দ্দার। তোমার নাম কিহে বাপু?

মধু। আমি গুরুদাস বাবুর বাটীর একটি চাকর।

প্রথম। জেলে কেন?

মধু। যদি উদ্ধার পাই, তবে সব বলিব। আপনাদের সঙ্গে অনেক-বার দেখা সাক্ষাৎ হবে।

এই কথার পরে মধু, ঘোষ ও বসু মহাশয়ের সহিত অনেক পরামর্শ হইল, কথার শেষে মীমাংসা এই হইল;—তাহারা তিন জনে জেল হইতে বাহির হইলে, গুরুদাস বাবুর বাড়ীগুলি নিশ্চয় উদ্ধার হইবে।

পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, ইঁহারা নবীনের বাড়ী ভাড়ার জামিন থাকায়, ভাড়ার ডিক্রীর টাকার জন্য দেওয়ানী জেলে আসিয়াছেন। নবীন, শশিকৃত উইল লাভ করিবার মানসে তাহাদিগকে জেলে আনি-য়াছে। এই সময়ে জেল সংস্কার হইতেছিল, এই কারণে দেওয়ানি ও ফৌজদারী জেলের লোক একস্থানে বাস করিত।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

মধুর মুক্তি।

বৈশাখের প্রথম ভাগ, আকাশের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জলদপটল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছে। পত্র নড়িতেছে না। নিদাঘের প্রচণ্ডতাপে নরনারীগণ ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইতেছেন। গাভীকুল ব্যাকুলচিত্তে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। বিহগকুল ভীতচিত্তে কুলায়াভিমুখে যাইতেছে। শিশুগণ খেলা ভুলিয়া শান্ত হইয়া মায়ের বক্ষে মুখ লুকাইয়াছে। পাঠক! তুমি অবশ্যই মুষলধারে বৃষ্টি ও ভয়ানক ঝড়ের আশঙ্কা করিতেছ, কিন্তু কিছুই না, একটু শীতলবায়ু বহিল, গুড় গুড় করিয়া একটু মেঘ গর্জ্জন হইল, গোটা কয়েক বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িল, কোথাকার মেঘ কোথায় চলিয়া গেল। সংসারের অনেক ঘোর বিপদের আড়ম্বরের পরে কাহারও কাহারও এইরূপে শান্তি সুখ লাভ হয়

ফৌজদারী আদালত! তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার। ফৌজদারী হাকিম! তোমার শ্রীচরণেও প্রণিপাত। পুলিশকোর্ট! তোমার চরণেও নমস্কার। আইনবলে—সহস্র দোষী ব্যক্তি খালাস পাউক, কিন্তু একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তিও যেন দণ্ড না পায়। আইনে বলে, বিবাদীর বিরুদ্ধে যতক্ষণ না দোষ সপ্রমাণ হয়, ততক্ষণ তাহাকে নির্দ্দোষ ব্যক্তি মনে করিবে। আসামীর দোষ প্রমাণের ভার ফরিয়াদীর উপর। দুই চারিজন ভাল হাকিম না আছেন, এ কথা বলি না, কিন্তু অনেকেই আসামীকে দেখিবামাত্র দোষী মনে করেন। বিচারালয় চোর দস্যুর দণ্ডালয়! তুমি পরের দোষের দণ্ড করিবার জন্য দ্বার গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া আছ, কিন্তু তোমার উদরে সহস্র সহস্র তস্কর। তোমার ব্যবহার-শাস্ত্রোপজীবিগণের মধ্যে দশ আনা প্রথম শ্রেণীর তস্কর, তাহাদের মহুরেরগণ বাটপাড়। আর তোমার উদরে তোমার পোষ্যপুত্র যে কেরাণিগণ আছেন, তাঁহারা গাঁইট্‌ কাটা। প্রথম দুই শ্রেণীর তস্কর, বাটপাড় লোককে ভুলাইয়া, মিষ্ট কথা বলিয়া লোককে কার্য্য করিয়া দিবার আশ্বাস দিয়া, তাহাদের অর্থ অপহরণ করে, তোমার পোষ্যপুত্রগণ লোককে কাছে ঘেঁসিতে না দিয়া, কটূক্তি করিয়া, তাড়াইয়া খেদাইয়া, কার্য্য নষ্ট করিয়া, নির্য্যাতন করিয়া অর্থ অপহরণ করে। আদালত! তুমি নিজের গৃহের দোষ দূর করিতে পারিলে না, বহিঃস্থ প্রকৃত দোষী ব্যক্তির দণ্ড কি প্রকারে দিবে?

পুলিস ও ফৌজদারী আদালত! তোমরা দলিলের ধার ধার না, সময়ের অপেক্ষা কর না। দুই জন একজনকে দোষী বলিল, অমনি তাহাকে জেলে পুরিলে। তোমরা সহায় সম্পদের কিঙ্কর। যাহার ধন বল আছে, জনবল আছে, সে তোমাদের আশ্রয় লইয়া, তাহার দুর্ব্বল

শক্রকে নিপীড়িত করিতেছে। সময় ধর্ম্মহীন হইয়া উঠিয়াছে। সহরে নগরে প্রতি গ্রামে দিন দিন মিথ্যাবাদী সাক্ষ্যব্যবসায়িদল বৃদ্ধি পাইতেছে। ধনীর আর চিন্তা নাই, দীনের আর উপায় নাই।

নিঃসহায় দীন। তুমি এ বিচারে কষ্ট হইও না। এ বিচারে কষ্ট পাইয়া বিধাতাকে ধিক্কার দিও না তুমি দেবর্ষি নারদের বাক্য কি জান? নারদ সাধকচূড়ামণি ধ্রুবকে বলিয়াছিলেন, "সম্পদের অভ্যুদয়ে পুণ্যক্ষয় জানিবে, দুঃখের আগমনে ভাবিবে পাপ ক্ষয় হইতেছে। আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির আগমনে সন্তুষ্ট হইবে, আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির আগমনে দয়া করিবে, ও সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিতে প্রয়াস পাইবে।" শাস্ত্র যদি ঠিক হয়, এতকালের মানবচিন্তা যদি নিরর্থক পণ্ডশ্রম না হয়, তবে আর এক বিচারের দিন আসিবে। যে দিন জানিবে নিশ্চয় তোমার জয়। এই শাস্ত্রোপদেশে বুক বাঁধিয়া ঠিক হইয়া থাক।

আইন-ব্যবসায়িগণ, তোমাদিগকেই বেশী আক্রমণ করিতে ইচ্ছা হয়। তোমরা শিক্ষিত, তোমরা হয় ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন, তোমাদের দোষ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে। তোমরা ধর্ম্ম পথে থাকিয়া, ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য করিয়া, যদি সমাজের পাপভার লাঘব করিতে চাও, তবে তোমরা কৃতকার্য্য হইতেও পার। কিন্তু কি পরিতাপ। তোমাদের মধ্যে এমন দুই এক জন পশু দৃষ্ট হয় যে, জানিয়া শুনিয়া নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে জেলে পুরিয়া নিজ পরামর্শে সত্ত্ববানকে স্বত্বহীন করিয়া লোককে পাপপথে চালাইয়া দিয়া বড়মুখে বড় হাসি হাসিয়া, বাহাদুরির একশেষ দেখান। রে পাষণ্ড! সত্য উপকরণ না লইয়া ধর্ম্মসীমার বাহিরে যাইয়া যে কার্য্য করিলে, সে ত তস্করের কার্য্য। নিজে মজিলে, পরকে

মজাইলে! চুরি করিয়া, ভাল চোর বলিয়া, যদি বাহাদুরি করিতে চাও, তবে শিক্ষার মুখসখানা খুলিয়া চোর-দস্যুর দলে মিশিলেই পার। ব্যবহার-শাস্ত্রজীবিগণ! তোমাদিগকে এই কথা বলি কেন? অরণ্যে কেহ রোদন করে না। দেশীয় হাকিম! তাঁহারা নিষ্ক্রিয়, প্রতি পাদবিক্ষেপে কত কাল্পনিক বিভীষিকায় ভীত হইয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন। বিশেষতঃ বিচারবিভাগের কর্ম্মচারিগণের মলমূত্র পরিত্যাগেরও সাহস আছে কি না সন্দেহ করি। একজিকিউটিভ ডিপার্টমেণ্টের অনেক যোগ্য ব্যক্তি—অনেক সময়ে অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। যে কিছু দেশের উপকারের চেষ্টা, যে কিছু দেশের কল্যাণের চেষ্টা, তাহা ব্যবহার-শাস্ত্রজীবিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তোমরা স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছ, দলেও পুষ্ট আছ, তোমাদের প্রতি অনেকে অনেক আশা স্থাপন করে, তাই তোমাদিগকে দুই কথা বলি। দেশের উন্নতি তোমাদের দ্বারা সাধিত হয়, গুণীর গুণ-মর্য্যাদা তোমরা রক্ষা কর, ভিক্ষুকের ভিক্ষা তোমরা দান কর। জেলায় যাও, মহকুমায় যাও, তোমাদের বাসাই অতিথিশালা, তোমাদের বাসাই পান্থশালা, তোমাদের বাসাই ছাত্রবৃন্দের অবস্থিতি ও বিশ্রাম শালা।

অদ্য লালবাজার পুলিস কোর্টে লোক ধরে না—লোকে লোকারণ্য, জনতার মধ্যে অধিকাংশই স্কুল ও কলেজের ছাত্র। জেনারেল এসেম্ব্রির সব ছাত্র আসিয়াছে, অপরাপর স্কুল কলেজের ছাত্র তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছে। জেনারেল এসেমব্রি কলেজের জার্ডিন সাহেব সুলভ সংবাদ পত্রের প্রকাশক, গুরুদাস বাবু, রাধিকাবাবু, অম্বিকাবাবু প্রভৃতি অনেকে আসিয়াছেন।

মধু আসামীর ডকে উঠিয়াছেন। তাঁহার রোদনস্ফীত ও রক্তবর্ণ

নেত্রযুগল হইতে বারিধারা পড়িতেছে। মধুর পক্ষীয় লোকেরা তাঁহাকে সাহস দিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষের জিজ্ঞাসাকারী জিজ্ঞাসা করিতেছেন;—"তোমার নাম কি?"

সের আলি মীর। বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর, পেশা পাহারাওয়ালার কার্য্য।

নাম জিজ্ঞাসার পরে মীর সাহেব যে জবানবন্দী দিল, তাহার মর্ম্ম এই;—আমি মধুসূদন দত্তকে চিনি, [মধুকে দেখাইয়া] ঐ মধুসূদন দত্ত। আমি গত শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার সময়ে বাগবাজারে পাহারা দিতেছিলাম। মধু দত্ত গোপেশ্বর ঠাকুরের দোকানে বসিয়াছিল, তাহার গায়ে দুইটা জামা ছিল, একটা জামা বসার গতিকে একটু সরিয়া পড়ায়, তাহার নীচের জামার পকেটে লাল ফিতায় বান্ধা এক তাড়া কাগজ দেখিলাম। ইহার পূর্ব্বে লাল ফিতায় এক তাড়ায় ৫০০ পাঁচ শত টাকার নোট হারাইয়াছে, এই বিজ্ঞাপন আমাদের থানায় আসিয়াছিল। আমি ঐ ফিতায় বান্ধা কাগজ দেখিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম। আসামীকে কাগজ বাহির করিতে বলিলে, সে কাগজ গোপন করিল। আমি তাহাকে ধরিতে গেলাম, সে দৌড়িয়া পলাইল, আমি তাহাকে বহুকষ্টে গ্রেপ্তার করিয়াছি। তাহার নিকট এই নোটগুলি পাইয়াছি। নোট কাহার কিরূপে পাইল এই সকল কথার আসামী, সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। আমি তাহাকে থানায় লইয়া আসিলাম। থানায় আসিয়া জগচ্চন্দ্র বসুর নোটের তালিকার সহিত মিলাইয়া দেখিলাম, এ নোট সকল জগৎ বসুর।

জেরায়।—আসামী দোকানের চৌকির উপর বসিয়াছিল। আমি তাহার ১২।১৪ হাত দূরে উত্তর পশ্চিম দিকে দাঁড়াইয়াছিলাম। আসামী

দক্ষিণদিকে পলাইতে চেষ্টা করে। আমি তাহাকে প্রায় দোকান হইতে ৩০০ হাত দূরে গ্রেপ্তার করি। গোপেশ্বর ঠাকুর আমার কোন সহায়তা করে নাই। গোপেশ্বর ঠাকুর ও নিশিকান্ত ঠাকুর আসামীর নিকট নোট পাওয়া ও গ্রেপ্তার করা জানে।

২ নং গোপেশ্বর ঠাকুরের জবানবন্দির মর্ম্ম—

আমার নাম গোপেশ্বর চক্রবর্ত্তী, পিতার নাম মহানন্দ চক্রবর্ত্তী, বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়, মোঃ বাগবাজার, বয়স ৩৫ বৎসর। এই আসামী মধুসূদন দত্ত গত শনিবার বেলা ৩টার সময় আমার দোকানে জলপান করিতে আইসে। আমি ঘটি করিয়া জলপান করিতে দেই। অনেক জল এক সঙ্গে পড়ায় আসামীর কোঁচার কাপড় ভিজিয়া যায়। আসামী কোঁচার মুড়া হইতে নোটের তাড়া বাহির করে। আসামী নোট খুলিয়া দেখে, ভিজিয়াছে কি না। এই সময়ে পাহারাওয়ালা আসামীকে ধরে। আসামী বলে সে চোর নহে। যাহার নোট তাহাকে দিতে যাইতেছে। নোট তাহার দোকান ঘরে কুড়াইয়া পাইয়াছিল। এই নোট সম্বন্ধে আসামী খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছে। পাহারাওয়ালা আসামীকে যখন গ্রেপ্তার করে, তখন আমাকে চুপে চুপে বলে, "পঁচিশ টাকা পুরস্কার পাওয়া যাইবে, আমার কথামত সাক্ষ্য দিও; তোমাকে পাঁচ টাকা দিব।" আর যদি তাহার কথামত না বলি, তবে আমাদিগকেও চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবে। এই ভয়ে আমরা পাহারা-ওয়ালাকে বলিয়াছি, তাহার উপদেশ মত সাক্ষ্য দিব। আমার চৌদ্দ পুরুষে মিথ্যা কথা বলে নাই ও সাক্ষ্য দেয় নাই। আমি নরকে যাইব, তাহার উপর আর মিথ্যা কথা বলিব না।

আসামীর উকিল এই সাক্ষীকে আর জেরা করিলেন না।

৩য় সাক্ষী নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঠিক গোপেশ্বরের মত বলিল।

৪র্থ সাক্ষী জগচ্চন্দ্র বসুর জবানবন্দির মর্ম্ম এই ঃ—আমার নাম জগচ্চন্দ্র বসু, পিতার নাম শূলপাণি বসু, সাকিন ঢাকা আমলা পাড়া, মোঃ—টালা। বয়স পঞ্চাশ বৎসর, পেশা চাউলের আড়তদারী। এই নোটগুলি আমার। এই নোটগুলি আমি কোথায় হারাই, বলিতে পারি না; আমার দোকান হইতেও হারাইতে পারে এবং আমিও কোথায় ফেলিয়া আসিতে পারি। আসামীকে আমি চিনি, এ জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজের ছাত্র ও জলখাবার বিক্রেতা।

জেরায়।—যে দিন আমার নোট হারায়, সেই দিন আমি হেদোর কলেজে গিয়াছিলাম। আসামীকে খুব ভাল লোক বলিয়া জানি, আসামীর ঘরেও গিয়াছিলাম এবং তথায় বসিয়াছিলাম।

বিচারক এই সকল জবানবন্দি শুনিয়া বলিলেন, "সাক্ষী সব বাধ্য করিয়া লওয়া হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয়। আমি চার্জ্জ করিতেছি না, আসামীর জবাব লইব ও আসামীর পক্ষ হইতে দুইটি সাফাই চাহি।"

আসামীর উকীল এই কথায় হাসিলেন, তিনি তখনি আসামীর জবাব লইতে বলিলেন, এবং সেই সময়েই সাফাই দিবেন মত প্রকাশ করিলেন।

আসামী মধুর জবানবন্দির মর্ম্মঃ—আমি নোট চুরি করি নাই, আমার দোকানে কুড়াইয়া পাইয়াছি, সংবাদ পত্রে আমাদের কলেজের প্রাচীরে কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন দিয়াছি। জগৎ বসুকে নোট দিতে যাইবার পথে গোপেশ্বরের দোকানে পাহারা-ওয়ালা আমাকে অন্যায় করিয়া ধরে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

এই জবাবের পর শান্তমূর্ত্তি জার্ডিন সাহেব আসিলেন। তাঁহাকে আসামীর পক্ষে সাফাই দিতে দেখিয়া বিচারক চমৎকৃত হইলেন।

জার্ডিন সাহেব প্রথমে বাইবেল চুম্বন করিলেন ও নাম ধাম বলিয়া কহিলেন—"আমি আসামীকে চিনি। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর-চরিত্র বাঙ্গালী যুবা আমি আর দেখি নাই। মধু দোকানঘরে নোট পাইয়াছে, তাহা আমি জানি, সে কখনও চোর নহে, আসামী রবিবারে আমাকে নোট দেখায় ও নোট সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করে। আমি আমার স্বাক্ষরিত এই বিজ্ঞাপন আমার কলেজের প্রাচীরে দিয়াছিলাম। [পকেট হইতে বাহির করিয়া বিজ্ঞাপন বিচারকের সম্মুখে রাখা হইল।] এ যে শনিবারে নোট দিতে টালায় জগৎ বসুর নিকট যাইবে, তাহাও আমাকে বলে।"

মাননীয় জার্ডিন সাহেবকে জেরা করা হইল না।

সুলভ সংবাদ-পত্রের প্রকাশকের জবানবন্দীর মর্ম্ম এই :—[প্রথম হলপান্তে নাম ধাম ইত্যাদি] এই আমার ১৭ই ফাল্গুনের সংবাদ পত্র। এ পত্র খানি আমি প্রকাশ করি। [একটী বিজ্ঞাপন দেখাইয়া] এই বিজ্ঞাপন এই আসামী আমার কাগজে প্রকাশ করিতে দেন, এবং আমি প্রকাশ করি।

এই সাক্ষীকে প্রশ্ন কর্ত্তা জেরা করিবার উপক্রম করিলে বিচারক নিষেধ করিলেন।

অনন্তর মধু নির্দ্দোষী প্রমাণ হইয়া মুক্তি পাইলেন। ভারতীয় দণ্ড-বিধি আইনের ২১১ ধারা মতে মিথ্যা অভিযোগ করা অপরাধে মীর সাহেব পাহারাওয়ালার সপরিশ্রমে দুই বৎসরের কারাদণ্ড হইল। মধু জগচ্চন্দ্র বসুর প্রতিশ্রুত এক শত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

গুরুদাস বাবুর বাড়ী উদ্ধার।

মহাকবি সেক্ষপিয়র বলিয়াছেন, "মানব পৃথিবী-রঙ্গমঞ্চে সপ্তকালে সপ্তঃপাঠ অভিনয় করেন। শিশু, বালক, যুবক ইত্যাদি সপ্তকালের সপ্ত পাঠ।" জীবনের সপ্তকালে সপ্ত পাঠ অভিনয় করুক কিন্তু আমি বলি, সংসার-রঙ্গমঞ্চে মানব এক জীবনেই একসঙ্গে কত পাঠ অভিনয় করে। নবম বর্ষীয় বালক মধুর সহিত আমাদিগের প্রথম দেখা হইয়াছে। সে এই গত আট বৎসরে কত পাঠই অভিনয় করিল। এখানে মধুকে একবার মামলাকারী সাজে সাজাইয়া, তাহার দ্বারায় মোকদ্দমাকারীর পাঠ অভিনয় করাইব। আমি আরও দেখাইব, সাধুর পবিত্র করস্পর্শে বিষের ক্ষেত্রেও অমৃত উৎপন্ন হয়।

মধু জেল হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া গুরুদাস বাবুকে শ্যামাচরণ ও কৃষ্ণবিহারীর সহিত যে কথা হইয়াছিল, তাহা বলিলেন। শশিমুখী এখনও

জীবিত আছে, তাহাও জানাইলেন। শ্যামাচরণ শশিমুখীর নিকট হইতে আসিয়া গুরুদাস বাবুর বাড়ী ক্রয়ের দালালি করিয়াছিল। মধু যে দিন জেল হইতে মুক্ত হয়, শ্যাম ও কৃষ্ণ সেই দিন টাকা দেওয়ায় দেওয়ানী জেল হইতে মুক্ত পায়। গুরুদাস শ্যামকে ডাকাইয়া আনিলেন। শ্যাম-বাবু পরিষ্কাররূপে বলিল,"শশিমুখী নবীনের বাটীর মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তাহার মৃত্যুর সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। শশী তাহার সকল সম্পত্তি, শ্যামের নামে রেজেষ্ট্রী উইল করিয়া দিয়াছে। সেই উইল প্রবেট্ করিতে গেলে, শশী বাহির হইয়া পড়িবে। শশিমুখী বাহির হইলেই গুরুদাস তাহার বিরুদ্ধে, বাড়ী বিক্রয়ের সম্বন্ধের বিশ্বাসঘাতকতার ও প্রতারণার ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে পারিবেন। চতুর নবীন করার অনুসারে ধর্ম্মভয়ে শশীকে জেলে যাইতে দিবে না—তখন একটা মীমাংসা হইবে।"

এই কথোপকথনের পর শ্যামের উইল প্রবেটের ভার মধুর উপর পড়িল। শশী বাহির হইলে, তাহার নামে ফৌজদারী মামলা করার ভারও মধুর উপর পড়িবে স্থির হইল। এটর্ণি শ্যামধন দত্ত মহাশয়ের দ্বারা উইল প্রবেট্ করা স্থির হইল, মধু কাগজ পত্র ও টাকা লইয়া শ্যামধন বাবুর আফিসে গমন করিলেন। মধু তাঁহাকে মূল ঘটনা বলিলেন। ধার্ম্মিক শ্যামধন বাবু প্রথমে নবীনের নামে উকীলের চিঠি দেওয়া স্থির করিয়া মধুকে এক সপ্তাহ পরে পুনরায় তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন। মধু যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনি বলিলেন, "নবীন ধূর্ত্ত, চিঠিতে কিছু হইবে না।" দত্তবাবু বলিয়া দিলেন, "চিঠি দিয়া দেখা যাউক, মোকর্দ্দমায় কাহারও লাভ নাই।"

শ্যামধন বাবুর কথা অনুসারে মধু এক সপ্তাহ পরে পুনরায় তাঁহার নিকট আসিলে দত্ত বাবু বলিলেন, "নবীন চিঠি পাইয়া আসে নাই,

উইল প্রবেট্ করিতে হইবে।” মধু তাহাতে সম্মতি দিয়া, তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্বিতল আফিস হইতে সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতে-ছিলেন; অবতরণকালে দেখিলেন, তাঁহার হুগলি কলেজের বন্ধু নবীনচন্দ্র সরকার, সেই সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছেন। চারি চক্ষুর মিলন হইল; উভয়ের মুখে মধুর হাসি দেখা দিল।

মধু জিজ্ঞাসা করিলেন, “নবীন বাবু! এখানে কেন?”

নবীন। “একটী উইল প্রবেটে বাধা দিতে। আপনি এখানে কেন?”

মধু। একখানি উইল প্রবেট্ করাইতে।

নবীন। আপনি কি আমার বিপক্ষে কার্য্য করাইতেছেন?

মধু। তা হ'তে পারে, কিন্তু আমি যে নবীন বাবুর বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছি, তাঁহার চরিত্র অতি বদ্ শুনিয়াছি।

নবীন। কার উইল প্রবেট্ করাচ্ছেন?

মধু। শ্যামাচরণ ঘোষের নামীয়। প্রবেট্ করাচ্ছেন, গুরুদাস বাবু।

নবীন। ঠিক ঠিক, তা'হলে আপনি আমার বিপক্ষ বটে। বিপক্ষের চরিত্র লোকে বদ্ই দেখে। আমি যে কারণে বদ্ তা ভাই সব বলছি। এখন মেটে কি না?

মধু। মিট্‌বে না কেন? গুরুদাস বাবু অতি ভদ্রলোক।

নবীন। আসুন, তবে দত্ত বাবুকে ব'লে যাই, প্রবেটের দরখাস্ত যেন দুই চারি দিন পরে হয়।

এই কথার পরে নবীন ও মধু শ্যামধন বাবুর নিকট গমন করিলেন। মধু তাঁহার নিকট নবীনের পরিচয় দিয়া, চারিদিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তিনিও তাহাতে সম্মত হইলেন। উভয়ে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন, পথে বাহির হইয়া নবীন কহিলেন, “ভাই! আমি বদ

কেন শুন। বাবা ৪।৫ খানা বাড়ী ও ৪ লক্ষ টাকা নগদ রেখে মরেন। বাবা দালালী কর্‌তেন। বাবার মৃত্যুর পরে দাদা সেই দালালী পেলেন, কিন্তু অপব্যয় বড় বেশী কর্‌তে লাগলেন। পনর বৎসর বয়সে যখন আমি হিন্দুস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন বাবা মরেন। আমি এণ্ট্রান্স পাস ক'রে দাদার অপব্যয়ে একটু একটু বাধা দিতে লাগ্‌লুম; বৌঠাকুরাণীর পরামর্শে আমি আমার টাকা ও বাড়ী ভাগ করে নিতে গেলুম। দাদা আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন, আমি মেসে থেকে বৌঠাকুরাণীর গহনা বন্ধক দিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লুম। দাদা জান্‌তে পেরে বৌঠাকুরাণীর গহনাগুলি কেড়ে নিলেন, আমি বিষম বিপদে প'ড়ে হাবড়ায় যেয়ে ২৫৲ টাকার কেরাণী হলুম। দাদা ব্যাঙ্ক থেকে চারি লক্ষ টাকা বের করে নিয়ে, দুই লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ করেন। আর দুই লক্ষ টাকা আমার ভয়ে শশীর নামে আট-খানা আর বৌঠাকুরাণীর নামে চারিখানা বাড়ী করেন। দাদা বিলক্ষণ টাকা পেতেন, তাই পৈতৃক টাকা নষ্ট করেন নাই। তাঁহার নিজের টাকায় একখানা বাগান, আর বাদায় একখানা আবাদ করেছেন। তিনি ছয় বৎসরমাত্র কার্য্য ক'রে মারা পড়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বৌঠাকু-রাণী আমাকে বাড়ীতে এনেছেন। শশী দাদার মৃত্যুর দশদিন পরে তাহার নামের দেড় লাক্ টাকার আটখানা বাড়ী বায়ান্ন হাজার টাকা লয়ে আমার ভয়ে বেচে। আমি নানা কৌশলে তাকে বাধ্য ক'রে পৈতৃক টাকার খরিদা বাড়ীগুলি আট্‌কিয়েছি। শশী এখন আমার খুব বাধ্য। বয়স হয়েছে, সে কাশী যেতে চায়। গুরুদাস বাবুকে আমি স্থদ সমেত বায়ান্ন হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

মধু। আপনি আজ সন্ধ্যাকালে যাবেন, নিশ্চয় মিটিবে।

মধুর কথা অনুসারে নবীন সেই রাত্রিতেই গুরুদাস বাবুর বাটীতে গমন করিলেন। শ্যামাচরণ ও কৃষ্ণবিহারীকে তথায় ডাকা হইয়াছিল। সৎলোকের মধ্যে কার্য্য, সময়ের অপেক্ষা করে না। আটখানি বাড়ীর মধ্যে তিনখানি গুরুদাস বাবু ও পাঁচখানি নবীন পাইলেন। নবীন শ্যামের নিকট হইতে উইলখানি পাইবার জন্য তাঁহাকে ও তাঁহার আত্মীয় কৃষ্ণকে সহসা টাকার জন্য দেওয়ানী জেলে দিবার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কিছু অর্থ দিলেন। বাড়ীগুলির সম্বন্ধে মীমাংসাপত্র যথানিয়মে লিখিত পঠিত হইয়া আইন অনুসারে কায়েমি করা হইল। নবীন কেবল মধুর বন্ধু ছিলেন, এখন হইতে লাহিড়ী পরিবারেও আত্মীয়মধ্যে গণ্য হইলেন; শ্যাম ও কৃষ্ণের সহিতও নবীনের ঘনিষ্ঠতা বাড়িল।

প্রতি ঘরে মামলা যেন এইরূপেই মীমাংসিত হয়। হতভাগ্য বঙ্গমাতার সন্তানগণের শৌর্য্য বীর্য্য এক্ষণে অস্ত্র শস্ত্র ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা জাল, জুয়াচুরি দ্বারা আদালতে প্রকাশিত হয়। মামলা ধ্বংশের—সর্ব্বনাশের প্রশস্ত পথ। ব্যবহার শস্ত্রোপজীবিগণ সেই পথের প্রধান পথ প্রদর্শক। অতএব মামলা পরিহার পূর্ব্বক স্বকীয় স্বত্ব বজায় রাখিয়া তোমরা যদি ষোল আনার স্থলে বার আনা পাও, তাহাতেও বিরক্তি করিও না, বিনাশের পথে অগ্রসর হইও না।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মধুর বাড়ী ক্রয়।

শিক্ষা রুচির দাসী, না রুচি শিক্ষার দাসী? চিন্তা না করিয়া আমরা বলিতে পারি, শিক্ষার দাসীই রুচি, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে এ প্রশ্নের উত্তর বড় সহজ নহে। চিন্তায় উঠিবে, অগ্রে শিক্ষার না রুচির বিকাশ। কেহ বলিবেন, রুচি অনুসারে শিক্ষা, কেহ বলিবেন, শিক্ষানুসারে রুচি। গোল সমানই থাকিল। দার্শনিকের কথায় শ্রুতির বিরক্তি না জন্মাইয়া আমি বলি, রুচি, বিনয়, শিষ্টাচার, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি শিক্ষা-লতিকার ফল ফুল।

রাত্রি আটটা। গুরুদাসবাবু সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া বৈঠক-খানায় বসিয়া আছেন; তাঁহার বৈঠকখানা দ্বিতলের উপর একটী সুবৃহৎ গৃহ। মেঝের উপর একদিকে ফরাসের বিছানা, অপর দিকে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, সাজান রহিয়াছে। গুরুদাস বাবু ফরাসের বিছানায় উপবেশন করেন। বৈঠকখানার ভিত্তিগুলি প্রাচীন রীতি ও হিন্দুরুচি অনুসারে সজ্জিত। কোন চিত্রপটে যশোদা গাভী দোহন

করিতেছেন এবং কৃষ্ণ তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ; কোন চিত্রপটে গোষ্ঠলীলা,কোন চিত্রপটে পুতনা বধ, কোন চিত্রপটে কংসবধ, কোন চিত্রপটে দশ মহাবিদ্যা, কোন চিত্রপটে দেবীযুদ্ধ, কোন চিত্রপটে বালবধ, কোন চিত্রপটে রামরাজা ইত্যাদি দেবদেবী ও পৌরাণিক মূর্ত্তিতে ভিত্তিগুলি শোভিত। ফরাসের উপর বড় একখানি থঞ্চায় প্রকাণ্ড এক পিলসুজের শিরে বৃহৎ একটী মৃণ্ময় প্রদীপ গৃহ আলো করিয়া জ্বলিতেছে।

গুরুদাস বাবুর সম্মুখে কয়েকটী ব্রাহ্মণপণ্ডিত বসিয়া আছেন। কাহারও বাড়ী বরিশাল জেলার কোটালীপাড়ায়, কাহারও বাড়ী ঢাকার বিক্রমপুরে এবং কাহারও বাড়ী বা নিজ কলিকাতায় ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ন্যায়পঞ্চানন, কেহ স্মৃতিরত্ন ও কেহ কাব্যবিশারদ ছিলেন।

এক কাব্যবিশারদ কুমারসম্ভব কাব্য হইতে, সতীর মহাদেবের স্তোত্রাংশের একটি কবিতা পড়িলেন, স্মৃতিরত্ন স্বকৃত পদ্যবন্ধ কবিতা পড়িলেন, ন্যায়পঞ্চানন মোহমুদ্গরের কতিপয় শ্লোক পাঠ করিয়া ঘোর আড়ম্বরের সহিত "মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া মায়া ব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দের ন্যায়দর্শনসঙ্গত ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন ; মধ্যে মধ্যে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ও দুই এক কথা বলিতে লাগিলেন।

কাব্যবিশারদ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,"আমি কুমারের শ্লোকটী পাঠ করিয়াই এই অনর্থ বাধাইয়াছি।"

এই সময় দালাল শ্যামাচরণ ঘোষ আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। গুরুদাস তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। শ্যামাচরণ বসিয়াই বলিলেন, "অনেক প্রয়োজনীয় ও জরুরি কথা আছে। পণ্ডিত মহাশয়দিগকে বিদায় ক'রে কথাগুলি শুনুন, অনেক সময় লাগিবে।"

গুরুদাস গোপনে ন্যায়পঞ্চাননকে পাঁচ, স্মৃতিরত্নকে চারি ও কাব্যবিশারদকে তিন টাকা দিয়া বিদায় করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, ১লা বৈশাখ মাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের তিথি, সেদিন যেন মহাশয়দিগের পদধূলি এ বাড়ীতে পড়ে। অধ্যাপক মহাশয়েরা সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। অনন্তর শ্যামাচরণ বলিতে লাগিলেন, "যে জগৎচন্দ্র বসুর নোটের জন্য মধু বিপদে পড়েছিল, তা'র আজ কাল বড় শোচনীয় অবস্থা। তা'র চা'লের আড়ত ফেল হ'য়েছে, কয়েক খানা বালাম বোঝাই কিস্তি বালেশ্বরে তলাইয়াছে। তার প্রায় দশ হাজার টাকা দেনা। আড়তের দ্রব্যাদিতে তিন হাজার টাকাও শোধ হবে না, তবে টালার প্রায় পনর কাঠা জমির উপর একটা বাড়ী আছে; বাড়ীটীর চারিদিকে পাকা পাঁচিল, সম্মুখে একটী ছোট পুকুর, পুকুরের উত্তরে ছয়টী কামরা ও দুইটী বারান্দাযুক্ত একটী একতালা দালান। বাড়ীর মধ্যে পূবের পোতায় তিন কামরা ও এক বারান্দাযুক্ত পাকের দালান; এ ছাড়া বাড়ীর মধ্যে ও বাহিরে দুইটী পাকা পায়খানা আছে। পুকুরের চারিদিকে ফুলের বাগান, উত্তরের ঘাটটী বাঁধা ও উহাতে বেশ মাছ আছে। সে দুই এক দিনের মধ্যে কলিকাতা ছেড়ে না পালালে বড় বিপদে পড়িবে। বাড়ীটী কোনখানে বন্ধক বা দায় সংযুক্ত নাই, তা বেশ জানি; সে বাড়ীটী অল্পমূল্যেই বিক্রয় করিবে।"

গুরুদাস বাবু উত্তর করিলেন, "আমি টালার বাড়ী কিনব না, বাড়ীটী মধুকে কিনে দিতে পারলে হয়। মধু ও রাধুকে ডাক দেখি।"

অনন্তর মধু ও রাধু শ্যামের সহিত বাড়ী দেখিতে গেলেন এবং রাত্রি এগারটার সময় জগৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। গুরুদাস জগৎকে বলিলেন, "তুমি ঠিক কি হলে বাড়ীখানি বেচ্‌তে পার?"

জগৎ। খুব কম পক্ষে দুই হাজার টাকার কমে পারি না।

গুরু। দেড়ে পার না?

জগৎ। আজ্ঞা না। আমি বাড়ী হতে জিনিষপত্রগুলিও বা'র ক'রতে পারব না। আমার চারিদিকে দেনা, আপনারা যদি দয়া ক'রে আমার অতিথি হয়ে কিছু দ্রব্য বের ক'রে দিতে পারেন, তবে কিছু পারব, নচেৎ কিছুই নয়।

শ্যাম। আমি কাজির বিচার ক'রে বলি, সাড়ে সতেরতে দেওগে।

গুরু। সাড়ে টাড়ে নয়, পুর সতের শ।

জগৎ। আজ্ঞে তবে তাই; কালই কবলা ক'রে নিতে হবে, আজ মধুবাবু আমার বাড়ী অতিথিরূপে থেকে কিছু দ্রব্যাদি বের ক'রে দিন।

গুরু। মধু! যাও, তুমি জগতের বাড়ী থাকগে, উহার দ্রব্যাদি যদি কিছু বের ক'রতে পার, তবে বড় ভাল হয়। কা'ল আসবার সময় নির্ম্মলার কাছে যে টাকা পাও, লয়ে এস, বাকি আমি দিব। তোমার মা বোন ভাইকে এখানে রাখা উচিত, নির্ম্মলার আর পরের বাড়ী থাকা উচিত নয়, সে দিনই ত সর্ব্বনাশ হয়েছিল। বয়স্থা মেয়ের বড় সাবধানে থাক্‌তে হয়। এইজন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা অষ্টমবর্ষে কন্যাদান ব্যবস্থা করেছেন।

মধু সে রজনীতে জগতের বাটীতে থাকিল; একজন অতিথির যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া আসিবার সম্ভব, এক পোর্টমেণ্টে তদুপযোগী স্বর্ণরৌপ্যের দ্রব্য ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি লইয়া মধু বাটী হইতে বাহির হইলেন। এক প্রাচীনা পরিচারিকাকে বাটীর প্রহরী রাখিয়া জগৎও বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাড়ী মধুর নামে কবলা করা হইল।

শ্যামাচরণের প্রতি গুরুদাস বাবুর বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল। তাহার কথাতেই তিনি বাটী ক্রয় করেন এবং বাটীর কোন দায়-সংযোগ আছে

কি না, অনুসন্ধানও করেন নাই। গুরুদাস বাবুর বাড়ীতে দুই বেলা আহার করিয়া, সেই রাত্রির গাড়ীতে জগৎ বাটী রওনা হইলেন। গুরুদাস বাবুর দ্বারবানেরা পরিচারিকার বেতন পরিশোধ করিয়া, তাহাকে কিছু বকশীস্ দিয়া বিদায় করিল এবং বাড়ী দখল করিয়া লইল। মধু গৃহোপকরণ ও শয্যাদির সহিত সুন্দর বাড়ী পাইলেন।

গুরুদাস বাবুর উপদেশানুসারে দেশের বাড়ী অম্বিকা বাবুর পিতার জিম্মায় রাখিয়া, মধু মাতা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে কলিকাতায় আসিতে পত্র লিখিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই—"নিজের বাড়ীতে ও মাতা ভ্রাতার সহিত বাস না করিলে দিদির বিবাহের ভাল সম্বন্ধ হইবে না। দেশে কাহারও নিকট যদি কোন টাকা পাওনা থাকে তাহার আসল পাইলেও লইয়া আসিবেন।" মধুর পত্র মাতা যথা সময়ে পাইলেন এবং সত্বর কলিকাতা আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নির্ম্মলাও জানিতে পারিল যে সত্বর তাহাকে টালার বাড়ীতে যাইতে হইবে। সে ভাদুড়ী-বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে জানিয়া ভাদুড়ী পরিবারে হর্ষবিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল।

কর্ত্তা গৃহিণী গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমাদিগের গৃহলক্ষ্মী শীঘ্র অন্তর্ধান করিবেন। লক্ষ্মী উপযুক্ত নারায়ণে অর্পিত হইলে আমাদের সন্তোষের বিষয় হইবে।" জাড়গ্রামেও মহামায়ার গ্রাম-ত্যাগের কথা প্রতিবেশীগৃহে আন্দোলিত হইতে লাগিল। অনেকে বলিতে লাগিলেন, "গ্রামের আদর্শ রমণী, গ্রামের সতী লক্ষ্মী, গ্রাম ছাড়িয়া চলিলেন।" প্রতিবেশীগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট কাঁদিতে লাগিল। মন্দ লোকের বিয়োগেও যখন কষ্ট হয়, তখন মহামায়ার ন্যায় গুণবতীর গ্রামত্যাগে সকলে দুঃখিত হইবে না কেন?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা।

নিমন্ত্রণ বড় মধুর শব্দ। নিমন্ত্রণের কথা শুনিলে শিশুগণ নৃত্য করিতে থাকে, যুবতীদল গহনার আয়োজন করিতে থাকে, ঔদরিক ব্রাহ্মণগণ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, আধুনিক বাবুদলও ইহার নামে অসন্তুষ্ট হন না। বাস্তবিক কি রসনার তৃপ্তি সাধনের জন্য সকলের এত আনন্দ? কাহারও কাহারও পক্ষে রসনার তৃপ্তি সাধনও সুখের বিষয়, কিন্তু অনেকের সন্তোষ, আসঙ্গলিপ্সার চরিতার্থতায়। নিমন্ত্রণক্ষেত্র, বন্ধু বান্ধবদর্শন লাভের প্রশস্ত স্থান, পাঁচ রকমের কথার রঙ্গভূমি, একতা মিলনের প্রধান স্থান। পূর্ব্বে নিমন্ত্রণক্ষেত্র বালকের শিক্ষা, যুবকের বুদ্ধি ও প্রবীণের অভিজ্ঞতা প্রকাশের স্থান ছিল। হায়! আমরা কত কার্য্যের উদ্দেশ্যই ভুলিতেছি, কিন্তু বন্ধু বান্ধবের নিমন্ত্রণে সুহৃদাচরণের বৃদ্ধি।

নবীনচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাড়ী কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে। এই রাস্তা উত্তর দক্ষিণে লম্বা। ইহার পশ্চিমদিকে নবীনের বাড়ী। নবীনের বাড়ী অতি বৃহৎ নহে, অতি ক্ষুদ্রও নহে। বাড়ীটী প্রায় সাত আট কাঠা জমির উপর নির্ম্মিত এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা। পশ্চিমের দিকে অন্দর ও পূর্ব্ব দিকে বাহির বাটী। বাড়ীটীতে দ্বিতল দুইটি চক। পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বাটীতে প্রবেশ করিতে হইলে, প্রথমেই বাহির বাটীর সদর দ্বার পার হইতে হয়। এই দ্বার ঠিক বাহির বাটীর পূর্ব্ব প্রান্তের দালানের মধ্যস্থলে। এই দ্বারের উত্তর দিকে একটি ও দক্ষিণ দিকে দুইটি কামরা। বাহির বাটীর উত্তরের পোতায় পূজার দালান। দালানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আলোকময় ও শুষ্ক। কলিকাতার অনেক বাটীর পূজার দালানের ন্যায় ভিজা নহে. পূজার দালানের সহিত সংলগ্ন ভাবেই অন্দরে যাইবার দ্বার। সদর দ্বার দিয়া বাটীতে প্রবেশ করিয়াই প্রথমোক্ত দালানের পশ্চিমের বারান্দা দিয়া দক্ষিণ দিকে যাইয়া অল্প একটু পশ্চিমদিকে গেলেই বাহির বাটীর উপরে উঠিবার সিঁড়ি; অর্থাৎ সিঁড়িটী বাহির বাটীর দক্ষিণের দালানের পূর্ব্বপ্রান্তে। বাহির বাটীর দক্ষিণের দালানের বারান্দায় স্তম্ভের গায় জলের কল। উহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র চৌবাচ্ছা। বাহির বাটীর উঠানটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। বাহির বাটীর পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দায় লোহার রেল ও রেলের কোলে কোলে চীনের টবে নানাপ্রকার ফুল পাতাবাহারের গাছ। উঠানে পূজার দালানের সম্মুখে এক সারি মেটে টবে ও অপর সারি চীনের টবে নানাবিধ ফুলের গাছ। উঠানে ও বারান্দার কোলে কোলে মেটে টবে এক সারি গাছ আছে। দক্ষিণের দিকে, যেখানে জলের কল তাহার নিকট টব শ্রেণী সরল রেখা ক্রমে চৌবাচ্ছা বেষ্টন করিয়া

সাজান আছে ; সমস্ত উঠানে সযত্নে রক্ষিত শ্যামল দূর্ব্বাদল যেন সুন্দর হরিৎবর্ণ নৈসর্গিক কম্বলে আচ্ছাদিত আছে। বাটীর সদর দ্বার হইতে অন্দরের দ্বার পর্য্যন্ত একটী পথ-রেখায় ঐ কম্বল কাট পড়িয়াছে। এই বাহির বাটীর সর্ব্বপূর্ব্ব দালানে, যে দালানের দুই বারান্দার কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই দালানের উপরতলে অগ্রে নবীনের দাদার বৈটকখানা ছিল ; এখন নবীন তাহাতে বসেন।

নবীনের এই বাটীতে পূজার দালান ভিন্ন আর ছয় দালানে নিম্ন ও উপরতলে সর্ব্বসমেত বাইশটী কুঠুরী। বাটী নূতন ও নূতন চূণকাম করা। বাটীর জানালা দরজাগুলি বড় বড় ও তদ্দ্বারা রৌদ্র ও বায়ু অব্যাহতরূপে প্রতিগৃহে প্রবেশ করিতে পারে।

নবীনের যে বৈঠকখানার কথা বলা হইল, তাহার পূর্ব্ব বারান্দায় মেজের লালছিটযুক্ত কাল প্রস্তর বসান। সেই বারান্দার সম্মুখে পশ্চিমদিকে যে সুবৃহৎ কামরা, তাহার সমস্ত মেজেয় ম্যাটিং, ম্যাটিংয়ের উপর সতরঞ্চ, সতরঞ্চের উপর চাদর, চাদরের উপর তিনদিকে উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে ছোট বড় কারুকার্য্যময় অনেক তৈকা বালিস। গৃহে ঐ ফরাসের বিছানার উপর অনেকগুলি স্বর্ণ রৌপ্যের বাধা হুঁকা, প্রস্তর ও নারিকেলের সাদা হুঁকা ও আলবোলা সাজান আছে। গৃহে উত্তর দক্ষিণ লম্বাভাবে কারুকার্য্যময় একখানা পাখা আছে। গৃহের দেওয়ালের গায়ে দেশী বিদেশী অনেকগুলি ছবি ও কয়েকটী ঘড়ী আছে। প্রত্যেক দ্বারের নিকটে এক একখানি পাপোষ আছে।

এই কামরার দক্ষিণের কামরায়ও ম্যাটিং। ম্যাটিংয়ের উপর চেয়ার, টেবল, বেঞ্চ, কৌচ ইত্যাদি সুন্দররূপে সাজান আছে। এ গৃহের দেওয়ালেও পূর্ব্বগৃহের ন্যায় ছবি ও ঘড়ী, এবং গৃহমধ্যে পূর্ব্ব

পশ্চিম লম্বাভাবে একখানি পাখা। এই গৃহে নবীনের দাদা সাহেবদিগকে বসাইতেন।

নবীন প্রথমোক্ত বৈঠকখানায় বসিয়া নেপোলিয়ান বোনাপার্টির জীবন-চরিত পড়িতেছিলেন। এক একবার গাড়ীর শব্দে ও অশ্বের পদশব্দে অন্যমনস্ক হইতেছিলেন। বেলা সাড়ে তিনটা বাজিয়াছে, কলিকাতার রাস্তায় জল ছিটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময়ে কলিকাতার স্থানে স্থানের পাখিগুলা ডাকে; তাহারা ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। নবীন একা একা বলিলেন, "কৈ? এলো কৈ? তুটায় আসবে কথা, সাড়ে তিনটা হলো। মেয়ের বে কি দায় হয়েছে?"

এই কথা হইতে না হইতে মধু সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। নবীন সাদরে মধুকে বসাইলেন। মধু বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার মেয়ের বে? সম্বন্ধ আসাব কথা ছিল নাকি?"

ন। হাঁ, তুইটার সময় একটা সম্বন্ধ আসার কথা ছিল। আমার বড় ভায়ের মেয়ে।

ম। তাইত, পাত্র পাওয়া বড় কঠিন। আমারও ঐ বিপদ। আমাব এক ভগ্নির বে হয় নি। মা ভেবে ভেবে সারা হলেন। আমার সে চিন্তায় আহার নিদ্রা নাই। আপনার ভাইঝির বয়স কত?

ন। নয়, দশ।

ম। আপনার তো একটু সময় আছে। আমার আর কালবিলম্ব সয় না। আর তুই এক মাসের মধ্যে বে দিতে না পারিলে জাতি থাকিবে না। গুরুদাস বাবু ও ভাদুড়ী মহাশয়ও বের জন্য চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন। এই কথা হইতেছে, এমন সময়ে একটি পরিচারিকা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু! তাঁরা এসেছেন কি? জায়গা হবে?"

নবীন। তাঁরা আসেন নাই। দুখানা জায়গা করিতে বল। মধুর অদ্য নবীনের বাটীতে জল খাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। যে উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাহা আর পাঠকের বুঝিতে বাকি নাই। কিছুক্ষণ পরে দুই জনে বাটীর মধ্যে জল খাইতে গেলেন।

নবীন ও মধু রূপার থালায় করিয়া নানা সামগ্রী খাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক অর্দ্ধোদ্‌ঘাটিত দ্বার জানালায় কত কমল, গোলাপ, চম্পকবৎ নারী-মুখ-পুষ্প উদয় হইল; তাহাতে ভ্রমরনিন্দিত অক্ষিসকল বিরাজ করিতে লাগিল। নবীন ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "সে সম্বন্ধ আসে নাই। সে বর আসে নাই। ইনি আমার একটী বন্ধু।"

এই কথায় মুখ-পুষ্প-গুলি অন্তর্হিত হইল। নবীনের বিধবা ভ্রাতৃবধূ নিকটে আসিলেন। তিনি বড় সরলচিত্ত, অমায়িক স্বভাবের লোক; তিনি নিকটে আসিয়া মধুর পরিচয় লইলেন। মাথার দিব্যাদি দিয়া মধুকে এ দ্রব্য ও দ্রব্য আহার করাইলেন।

মধু জল খাইয়া নবীনের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া বিদায় লইলেন। নবীনের বাড়ীতে বড় গোল বাধিয়া উঠিল। নবীনের ভ্রাতৃবধূ জেদ করিতে লাগিলেন, মধুর সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে।

নবীন, "মধু নিঃসহায়, নির্ধন, উঁহাকে কন্যাদান করা হইবে না" ইত্যাদি আপত্তি করিলেন। ভ্রাতৃবধূ জেদ করিয়া বলিলেন, "আমি কোন কথাই শুনিব না। আমার দুইটী কন্যা ব্যতীত পুত্র সন্তান নাই। আমার অর্দ্ধেক ধন কনিষ্ঠ কন্যা পাইবে, তাহাতেই তাহাদের চলিবে।" যাহা হউক, নবীনের ভ্রাতৃবধূর জেদে আশু কোন ফল ফলিল না, আপাততঃ বিবাহের কথা স্থগিত থাকিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নবভবনে মহামায়া ও নির্ম্মলার আগমন।

লক্ষ্মী কি? লক্ষ্মীর শ্রীই বা কি? আমরা ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে লক্ষ্মী বলি। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, অভাব-অপ্রতুলতা-পরিশূন্য সাংসারিক ভাব ও অবস্থাকে লক্ষ্মীর শ্রী বলি। বাঙ্গালির প্রতিগৃহে ধন-ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বামাকুল। যে রমণীকুল ধন ধান্যের সুব্যবহার করিতে জানেন, ঘর, দ্বার, বসন, ভূষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারেন, যেরূপ অবস্থাই হউক, অভাব অপ্রতুলতা ঢাকিয়া চলিতে পারেন, তাঁহারাই বাঙ্গালী গৃহের লক্ষ্মী। গৃহিণীর গুণে বাঙ্গালী গৃহ আনন্দ-বাজার, গৃহিণীর দোষে বাঙ্গালীগৃহ অসুখের আগার।

জাড়গ্রামের লক্ষ্মীস্বরূপিণী মহামায়া গৃহের বন্দোবস্ত করিলেন। গৃহের কোন কোন দ্রব্য মুখোপাধ্যায় বাটীতে রাখিলেন, কোন কোন দ্রব্য সঙ্গে লইলেন। ঘরগুলির দ্বার চাবিবন্ধ করিলেন। চাবিগুলি

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে দিলেন। প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীগণে তাঁহার বাড়ী পূর্ণ হইল। মহামায়া প্রণম্যাগণকে প্রণাম করিলেন, আশীর্ব্বাদীয় ব্যক্তিগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহামায়া কান্দিলেন, তাঁহারাও সকলে কান্দিলেন। মহামায়া পুত্রদ্বয়ের সহিত মেমারি ষ্টেশনে যাইবার জন্য গরুর গাড়ীতে উঠিবার উপক্রম করিলেন। হলধর মুখোপাধ্যায়ের দন্তহীনা গৃহিণী "পুত্র কন্যা লয়ে সুখে থাক, আর কষ্ট না পাও, নির্ম্মলার ভাল বরে বে হক" ইত্যাদি কয়েক কথা বলিতে বলিতে হাউ হাউ করিয়া কাঁন্দিয়া ফেলিলেন। তখন উভয় দলের ক্রন্দন ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। জনতাদর্শনে দণ্ডায়মান পান্থগণও এ দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিল। মায়াময়ী মহামায়া গরুর গাড়ীতে মেমারি ষ্টেশনে যাত্রা করিলেন ও তাঁহার গ্রামের নরনারীগণও তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে করিতে ও কাঁদিতে কাঁদিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন!

মহামায়া কলিকাতায় আসিয়া টালার বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় স্কুলে ভর্ত্তি হইল। মধু দিবাভাগে লাহিড়ী-বাড়ীতে থাকিয়া দোকানদারী ও পড়া শুনা করিতে লাগিলেন এবং রাত্রিকালে টালার বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন।

ভাদুড়ী গৃহিণী ভাদুড়ী মহাশয়কে বলিলেন, "নির্ম্মলার মা, ভাই, কলিকাতায় এসেছে। কালী গঙ্গার দয়ায় টালায় একখানা বাড়ীও হয়েছে। নির্ম্মলার বয়স হয়েছে, তার আর বে না হ'লে চলে না; ভগবানের দয়া ছিল, তাই আজ নয় বৎসর একটী পূর্ণ লক্ষ্মী আমাদের ঘরে দিয়ে ছিলেন। মার যত্নে সংসারের কোন বাতাস গায়ে লাগেনি। এই কথা বলিতে বলিতে গৃহিণীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। কর্ত্তার চক্ষুতে জল আসিল। উভয়ে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিলেন। গৃহিণী চক্ষুর জল

মুছিয়া আবার বলিলেন, এখন মধুকে বলে ভাল দিন দেখে মাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

কর্ত্তা। (চক্ষুর জল মুছিয়া) তা শীঘ্রই দিতে হচ্ছে। একপ্রস্থ ভাল গহনা ও একখানা ভাল কাপড় দিতে হচ্ছে। তার বের খরচাও আমাদের দিতে হবে।

গৃহিণী। তাত হবেই। ভাল গহণা, কাপড় বের সময় দিলেই চলিবে। সম্বন্ধ হতে কত দিন লাগে, তার ঠিক নাই। এখন যে গহণা আছে, তাই লয়ে যাউক।

কর্ত্তা। না, সেই বের গহনা কাপড় এক্ষণে দেওয়াই ভাল। মা না পরে, হাতে করে যাবে। এই কথার পরে, কর্ত্তা মধুকে দিন দেখিবার কথা বলিলেন। নির্ম্মলা ২রা বৈশাখ বৈকালে বাড়ী যাইবেন জানিয়া ভাদুড়ী-বাড়ীর বালক, বালিকা, ভৃত্য, দাসী সকলেই দুঃখিত হইল। ছোট ছোট বালক-বালিকারা নির্ম্মলাকে ধরিয়া রাখিবে, সারিয়া রাখিবে, বান্ধিয়া রাখিবে, না হয় সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, ইত্যাদি কত পরামর্শ করিল।

কাল কাহারও দুঃখ দেখে না। ২রা বৈশাখ বৈকাল বেলা আসিল। নির্ম্মলার বাড়ী যাইবার পাল্কী আসিল। ভাদুড়ী-বাড়ীতে নির্ব্বাক রোদনের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। গৃহিণী নির্ব্বাকে কাঁদিতে কাঁদিতে নির্ম্মলার সুদীর্ঘ কুন্তলপাশ বাঁধিতে বসিলেন, নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহিণীর কেশবন্ধনে আপত্তি করিল না। কর্ত্তা নির্ব্বাকে কাঁদিতে কাঁদিতে একটী ভাল বাক্সে কতকগুলি নূতন ভাল গহণা কাগজে মুড়িয়া সাজাইতে লাগিলেন। বালক-বালিকারা নির্ব্বাকে কাঁদিয়া নির্ম্মলাকে ঘিরিয়া বসিল। দাস দাসী গৃহকর্ম্ম ছাড়িয়া নির্ম্মলার নিকট বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশুরা নির্ম্মলার কোলে বসিল।

নির্ম্মলার কেশবন্ধন সারা হইল, ভাল কাপড় পরা হইল, সঙ্গে লইবার দ্রব্য ঠিক হইল। পাল্কীবাহকেরা, ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল, তথাপি নির্ম্মলার শিবিকায় আরোহণ করা হইল না। শিশুরা নির্ম্মলার কোল ছাড়িল না, বালক-বালিকারা নির্ম্মলার হাত ও আঁচল ছাড়িল না। সন্ধ্যা লাগিয়া আসিল, গৃহিণী বলিলেন, 'মা! পাল্কীতে উঠ, ভাদুড়ী বাড়ীর লক্ষ্মী, উঠ।" নির্ম্মলার কোল হইতে শিশুদিগকে লওয়া হইল। নির্ম্মলার হাত আঁচল হইতে বালকবালিকাদিগকে ছাড়ান হইল নির্ম্মলা কাঁদিতে লাগিলেন, শিশু ও বালকেরা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল। নির্ম্মলা হীনজাতি, বাটীতে ব্রাহ্মণ নাই শিশু ও বালকদিগের কাহাকেও সঙ্গে লইতে সাহস করিলেন না। তাহাদের বড় রোদন দেখিয়া ও নির্ম্মলার মনের ভাব বুঝিয়া গৃহিণী দুই তিনটী নিতান্ত অবুজ শিশু ও বালককে নির্ম্মলার সঙ্গে লইতে অনুমতি দিলেন। তাহারা হাসিয়া শিবিকা আরোহণ করিল। যাহারা একটু বড়, তাহারা জলপূর্ণ চক্ষুতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহিণী তাহাদিগকে বলিলেন, "আজ না হয় কাল যেও, পাল্কীতে আর ধরে না। তোমার নির্ম্মলা দিদির বেতে যেয়ে যতদিন ইচ্ছা থেকো।"

নির্ম্মলা কর্ত্তা ও গৃহিণীর চরণবন্দনা করিলেন। কর্ত্তা কাঁদিতে কাঁদিতে নির্ম্মলার হাতে একটা বাক্স ও একখানি বারাণসী শাড়ী দিয়া বলিলেন, "মা, এগুলি তোমার বের দিনে পরিও।" কর্ত্তা গৃহিণী বড় করিয়া নির্ম্মলাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলেন না। চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। নির্ম্মলা রোদন করিতে করিতে শিবিকা আরোহণ করিলেন। বাহকেরা শিবিকা লইয়া হুঁ হুঁ করিয়া বাহির হইল।

কর্ত্তা গৃহিণী উভয়ে একসঙ্গে কাঁদিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "ভাদুড়ী-বাড়ীর পূর্ণলক্ষ্মী আজ অন্তর্হিত হইলেন। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা মাতৃহীন হইয়াও পুনরায় মা পাইয়াছিলাম। তাঁহার কৃপায় আমাদের বাটী আজ নয় বৎসর শান্তি-সুখের আবাস ছিল। নির্ম্মলা রমণীরত্ন; আমাদের এমন পুণ্য কি আছে যে, এই লক্ষ্মী চিরকাল আমাদের গৃহে থাকিবে?"

গুণের কি আশ্চর্য্য মহিমা! স্নেহের কি অপূর্ব্ব লীলা! পথের দানা, হীনজাতীয়া বালিকা আজ কন্যাস্থানীয়া হইয়া ভাদুড়ী পরিবার কাঁদাইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। মহামায়া ও নির্ম্মলা প্রকৃতই বঙ্গ-গৃহের লক্ষ্মী।

পাঠক, কয়জনের ভাগ্যে নূতন বাড়ী, নূতন ঘর, সুখের নিলয় হইয়া থাকে? কয় জনের সুখের আশা পূর্ণ হইয়া থাকে? আমরা ভাদুড়ী-বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণীর সহিত একমত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, মহামায়া ও নির্ম্মলা অনেক ক্লেশ পাইয়াছে, তাহা-দের নূতন বাড়ী যেন সুখের আগার হয়। তাহাদের সকল সুখের আশা যেন পূর্ণ হয়। নির্ম্মলা যেন অভিমত পাত্রের সহিত পরিণীত হন। মহামায়া যেন জীবনের শেষ ভাগ সন্তানসন্ততিগণের সহিত পরম সুখে অতিবাহিত করিতে পারেন। ক্লেশে তাঁহাদের পাপক্ষয় হই-য়াছে, এক্ষণে তাঁহাদিগের সুখের দিন আসুক।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সম্বন্ধ-নির্ণয়।

সাধারণ ও দৈবকার্য্যের গতি কি তুল্য? সাধারণ কার্য্যের গতিতে যাহা দশদিনে সম্পন্ন হয়, দৈবকার্য্যের গতি সে স্থানে একটি দিনেরও অপেক্ষা করে না। কুঠারযোগে একটী উদ্যান তরুশূন্য করিতে দশদিন লাগিবে, দৈবাৎ ঝটিকা তাহা এক ঘণ্টায় তরুশূন্য করিয়া দিবে। দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলন একরূপ অসম্ভব ছিল; দৈবশক্তি এক দিনের মধ্যে তাঁহাদের মিলন, প্রণয়, পরিণয় সম্পাদন করিয়াছিল। নির্ম্মলার বিবাহের চেষ্টায় আমরা বহুদিন আছি; এখন দেখি, দৈবশক্তিতে তাহা কত সত্বর সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।

অদ্য সন ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগ অথবা ইংরাজী ১৮৭৪ সালের এপ্রেল মাসের মধ্যভাগ। বুধবার, বেলা প্রায় ৫ চারিটা। অদ্য কলিকাতা গেজেটে সব-ডিপুটী পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। মধু, নবীন প্রভৃতি অনেকেই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মধুর কার্য্য হইয়াছে রাণাঘাটে ও নবীনের কার্য্য হইয়াছে জাহানাবাদে। তাঁহাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন হইয়াছে একশত টাকা। মধু অদ্য রজনীতে তাঁহার নিজের টালার বাটীতে সত্যনারায়ণ পূজা করিবেন; তিনি বেলা আড়াইটার মধ্যে জলখাবারের দোকানের কার্য্য সমাপন করিয়া নিজগৃহে আসিয়াছেন। মহামায়া, নির্ম্মলা ও মধু তিনজনেই উপবাসী আছেন। মধুর ভ্রাতৃদ্বয়ও অদ্য সকাল সকাল স্কুল হইতে আসিয়াছে। সত্যনারায়ণ পূজার সকল আয়োজন করা হইয়াছে। মধু এখন পর্য্যন্ত কোন পরিচারিকা রাখেন নাই। বাজার মধু নিজে করেন বা তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের কেহ করে এবং জল, বাটীর প্রাচীরের মধ্যে পুষ্করিণীতেই আছে, সুতরাং পরিচারিকা রাখিবার প্রয়োজনও হয় নাই।

দক্ষিণদিকের প্রাচীরের সদরদ্বার বন্ধ করিয়া মহামায়া, নির্ম্মলা, মধু, মাধব ও কেশব তাঁহাদের দালানের দক্ষিণের বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া আছেন। মহামায়া একখানি কাঁথা এবং নির্ম্মলা কার্পেটের জুতা সেলাই করিতেছেন আর মধু ভ্রাতৃদ্বয়কে অঙ্ক কষাইতেছেন।

মহামায়া বলিলেন, "আজ সত্যনারায়ণের নিকট মানস করব, যা'তে নির্ম্মলার একটী ভাল সম্বন্ধ জুটে।"

মধু। "সে দিন নবীন বাবুর বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি আমাদের স্বজাতি ও বড় লোক। তিনি তাঁর ভাইঝীর উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছেন না।"

অনন্তর মধু নবীনের সম্পূর্ণ পরিচয় দিলেন; কেবল বলিতে পারিলেন না, নবীন বিবাহিত কি না; কেন না, তাহা তিনি জানিতেন না। এই সময়ে সদর রাস্তায় বড় গোল উঠিল। স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। মধু, মাধব ও কেশব সেই দিকে দৌড়াইল।

এই সময়ে নির্ম্মলা বলিলেন, "মা! কাল রাত্রে বড় আশ্চর্য্য স্বপন দেখেছি। শেষ রাত্রে স্বপন দেখ্‌লুম, কার যেন একটা পোষা শারী-পাখীকে, একটা বড় বিড়াল আসিয়া খাঁচার দরজা খুলে ল'য়ে দৌড়িল। গৃহস্থেরা কয়েকজন শারীকে আনিতে ছুটিল। বিড়ালের মাথায় কি যেন পড়িয়া মরার মত হ'ল। এক সাধু শারীকে লইয়া তাঁহার আশ্রমে রাখিলেন। গৃহস্থেরা সে স্থান হইতে শারীকে লইয়া গেল। তার পরে শারীকে এক নূতন খাঁচায় রাখা হইল। তার পরে কি একটু স্বপন মনে নাই। এক সুন্দর শুক আসিয়া তাহার গলার সোনার শিকলের অপর মুড়া শারীর গলায় দিয়া দুইজনে জোড়া বান্ধিয়া উড়িয়া গেল।"

সেই স্বপ্ন বলা শেষ হইবামাত্র নির্ম্মলা ও মহামায়া চাহিয়া দেখেন, তাঁহাদের বারান্দার নিকটে মধু প্রভৃতির সহিত আর একটী অপরিচিত যুবা, কয়েকটী স্ত্রীলোক, বালিকা ও শিশু। অপরিচিত যুবকের প্রতি নির্ম্মলার দৃষ্টি পড়িল ও নির্ম্মলার প্রতি যুবকের দৃষ্টি পড়িল। নির্ম্মলা দেখিলেন, সেরূপ যুবা তিনি আর কখন দেখেন নাই; এবং যুবক দেখিলেন, সেরূপ রমণীরত্ন তিনি কখন দেখেন নাই। মহামায়া ও নির্ম্মলা ব্যস্তভাবে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। মধু যুবককে লইয়া বারান্দায় বসিলেন।

এই আগন্তুক যুবা নবীনচন্দ্র সরকার। আগন্তুক রমণীগণের মধ্যে একজন নবীন বাবুর ভ্রাতৃবধূ, অপরটী তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতুষ্কন্যা। বালিকাটী তাঁহার অনূঢ়া ভ্রাতুষ্কন্যা, শিশুটী জ্যেষ্ঠা ভ্রাতুষ্কন্যার পুত্র ও তৃতীয় স্ত্রীলোকটী দাসী। অদ্য প্রাতঃকালে নবীন তাঁহাদিগকে লইয়া বরাহনগর গিয়াছিলেন। বরাহনগরে একটী ষষ্ঠীতলা আছে। নবীনের ভ্রাতৃদৌহিত্রের অন্নাশনের কাল হইয়াছে। ষষ্ঠীতলায় শিশুর

কল্যাণে তাঁহারা পূজা দিতে গিয়াছিলেন। মধুর বাড়ীর নিকট রাস্তার উপর নবীন বাবুদিগের গাড়ীর ঘোড়া ক্ষেপিয়া উঠে এবং শকট ভগ্ন হয়; এই কারণে রাস্তায় স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল। কেহ কোন আঘাত পান নাই। স্ত্রীলোকদের রাস্তায় দাঁড়ান ভাল নহে বলিয়া মধুর আগ্রহে নবীন সকলকে লইয়া তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন, এবং নবীনের দ্বারবান আর একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া আনিতে গিয়াছে। নবীন মধুর নিকট সবডিপুটী পরীক্ষার ফল জানিয়া সুখী হইলেন।

নবীনের ভ্রাতৃবধূ অন্তঃপুরে গিয়া মহামায়ার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া জানিলেন, নির্ম্মলা অবিবাহিতা। পাঠক বোকা বলিতে হয় বলুন, নবীনের ভ্রাতৃবধূর মনে মুখে দুইরূপ ছিল না। তিনি নির্ম্মলাকে অনূঢ়া জানিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেশ বেশ, খুব ভাল হয়েছে, আর বাছার নড়া চড়ার যো থাকিবে না।" অনন্তর মহামায়াকে বলিলেন, বেয়ান্! আমার একটা কথা শুন্‌বেন?"

মহামায়া তাঁহার সরল ও প্রফুল্ল প্রকৃতি দেখিয়া সুখী হইয়াছিলেন। তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "বেয়ান! শুনব—কি বলবেন, বলুন?"

নবীনের ভ্রাতৃবধূ। বেয়ান বল্লেন, দেখবেন—যেন এই ডাকের অপমান না হয়। আমার ঠাকুরপোর সঙ্গে আপনার এই চাঁদের মত মেয়েটির বে দিন, আর আমার এই পাগ্‌লিটাকে মধুর গলায় গেঁথে দিন; নবীনে নির্ম্মলে আর মধুতে বিধুতে সুন্দর মিলন হউক।

মহামায়া। তা হ'লে তো খুব ভাল হয়, তবে আমাদের লাহিড়ী ও ভাদুড়ী বাবুর মত নিতে হবে। আপনারা যদি দয়া ক'রে এ কাজ করেন, তবে ত আমার সৌভাগ্যের কথা।

নবীনের ভ্রাতৃবধূ। দয়া আবার কি? আপনকার এ মেয়েটী

ঠাকুরপোকে দেখালে তার মাথা ঘুরে যাবে। সে বে কর্‌বে না তার ঘাড় বে করবে ; তার ভণ্ডাম সব দূরে যাবে।

এই কথা বলিয়া নবীনের ভ্রাতৃবধূ নির্ম্মলাকে ধরিয়া নবীনকে দেখাইতে চলিলেন। নির্ম্মলা ইহাতে বড় সন্তুষ্ট না হইলেও স্বগৃহে আগতা রমণীর অবাধ্য হওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। নির্ম্মলাকে বারান্দার নিকটের দ্বারের কাছে লইয়া গিয়া নবীনের ভ্রাতৃবধূ বলিলেন, "ঠাকুরপো! চুপে চুপে একটা কথা বলি শুনে যাও।"

নবীন না বুঝিয়া সেই গৃহমধ্যে গমন করিলেন। নবীনের ভ্রাতৃবধূ তখন নির্ম্মলার মুখের কাপড় খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো! এমন চাঁদের মত মুখ দেখেছ? এমন পদ্মপলাশলোচন দেখেছ?" (নির্ম্মলার প্রতি) "থুবড়ি হলি, তবু বে হলো না, চোক বুজিস্ ক্যানে মাগি?" (নবীনের প্রতি) "এমন দুধে আলতার রং দেখেছ? এমন চুল দেখেছ? এমন রাঙা হাত পা দেখেছ?"

নবীনের ভ্রাতৃবধূ এইরূপ কত কথা বলিলেন। নবীন হাসিয়া বলিয়া গেলেন, তোমার সব জায়গায় পাগলাম। বিপদ সম্পদ বুঝ না। বে তোমার একটা বাই হয়েছে।

অনন্তর নবীনের ভ্রাতৃবধূ তাঁহার কন্যা বিধুমুখীকে আনিয়া মধুকে ডাক দিলেন। কিন্তু মধু বুঝিতে পারিয়া নিকটে আসিলেন না। অগত্যা তিনি বিধুকে লইয়া মধুর নিকটে গেলেন এবং বলিলেন, "বাবা মধু! তুমি এই পাগলিটাকে বে কর। আর নির্ম্মলাকে ঠাকুরপো বে করুক; তা হলে বেশ হবে। আমি যাতে পারি, ঠাকুরপোকে বাধ্য করব। বাবা! যাতে এ কাজ হয়, তুমি তাহার চেষ্টা দেখ। (নবীনের প্রতি) ঠাকুরপো! তুমি কি বল?"

নবীন এতদিন নিজের বিবাহের কথায় ক্রোধ প্রকাশ করিতেন, এখন তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি এখন পাগলামি ক'র না। যে হয় হবে, এখন সে কথার সময় নয়।"

নবীনের ভ্রাতৃবধূ বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। তিনি অন্তঃপুরে গিয়া বলিলেন, "বেয়ান! হবে। ঠাকুরপো কুড়ে, উদ্যোগ করিবে না। আপনকার মেয়ে বড়, আপনি চেষ্টা করুন, আমাদিগের ঘটক আমি থাক্‌লুম।"

অতঃপর মধুর বাটীতে সকলে জলযোগ করিলেন। দ্বারবান্ গাড়ী লইয়া আসিল। নবীন মধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কলা কোথায় দেখা হবে? মধু উত্তর দিলেন, লাহিড়ী বাবুদের বাড়ীতে দেখা হবে। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নবীন সকলকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রূপের মোহ।

রূপের কি আশ্চর্য্য মোহ! চন্দ্রে, ফুলে, নবপত্রে, রূপ আছে; তাই শিশুও এই সকলের প্রতি অনিমেষ লোচনে দৃষ্টিপাত করে, পত্র পুষ্প হাতে পাইলে কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া নষ্ট করে। রূপে সংসার মুগ্ধ, রূপে তাপসের তপোভঙ্গ। ঈশ্বর এই জন্য সংসারকে রূপের ভাণ্ডার করিয়াছেন; তিনি স্থলে জলে নভস্তলে রূপ মাখিয়া রাখিয়াছেন। তিনি জীব-জগতে জড়-জগতে রূপ ছড়াইয়া দিয়াছেন। সংসার রূপে বাঁধা, রূপে সংসার বাঁধা। বৈজ্ঞানিক বলেন, মাধ্যাকর্ষণ ও যোগাকর্ষণ বিশ্ব-সংসারের বন্ধনরজ্জু। আমি বলি, রূপ ও স্নেহ জীবজগতের বন্ধনশৃঙ্খল।

নবীনের বয়স পঁচিশ বৎসর হইয়াছে। সাংসারিক গোলযোগে বিবাহচিন্তা তাঁহার মনে একাল পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। রূপবতী নির্ম্মলাকে দেখিয়া নবীনের মন কিরূপ হইল? যে দিন বৈকালে নবীন নির্ম্মলাকে দেখিলেন, সে রাত্রিতে তাঁহার আর নিদ্রা হইল না। তিনি

সমস্ত রাত্রি ভাবিলেন, রূপের কি আকর্ষণী অথবা বৈদ্যুতিক শক্তি আছে! আমি কত রূপবতী দেখিয়াছি, আমার মন ত এমন চঞ্চল হয় নাই! আমার মনে হয়, রূপ যেন তিন প্রকার। প্রথম, তৈলাদির দ্বারা ঘামানর পূর্ব্বে চিত্রিত পুতুলের রূপ। দেখিতে ভাল, কিন্তু রূপ গড়িয়ে পড়ে না। দ্বিতীয় প্রকার রূপ, ঘামান পুতুলের রূপ। দেখতেও ভাল রূপ যেন গড়িয়ে পড়ে। তৃতীয় প্রকারের রূপ আলোকের রূপ, বা বিদ্যুতের জ্যোতিঃ। সে রূপে ঘর দ্বার আলো করে। নির্ম্মলা শেষোক্ত শ্রেণীর রূপবতী। মানবী যে এত সুন্দরী হয়, তাহা আমি জানিতাম না। আষাঢ়ের মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশদাম জানুর নিম্নে পড়িয়াছে। ললাট, ভ্রূ, নাসিকা, চক্ষু, ওষ্ঠ, দন্ত ও চিবুক এত সুন্দর যে, তেমন সুন্দর ছবি কুমারটুলির কোন ভাল কারিকরকেও গড়িতে দেখি নাই। হস্ত, পদ মমের পুতুলের হস্ত পদ অপেক্ষাও ভাল। কি অপূর্ব্ব রূপ দেখিলাম। সে অপূর্ব্ব রূপের মনোহারিণী স্নিগ্ধ জ্যোতি যেন বাটীটির প্রবেশ দ্বার পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। লাবণ্যে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, চক্ষুতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। তাহাকে দেখিবামাত্র যেন সেই জ্যোতিঃ-প্রবাহ আমার হৃদয়ে আসিয়া সবেগে আঘাত করিল। আমার শরীর কম্পিত হইল, দেহ রোমাঞ্চ হইল। তারপর সেই রমণীরত্ন যখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মাতার সহিত আমাদের নয়ন পথের অন্তরালে সরিয়া পড়িল, তখন বোধ হইল যেন, এক অপূর্ব্ব জ্যোতীরাশি এক অপূর্ব্ব গতিতে স্থানান্তরিত হইল। কি অপূর্ব্ব গতি! কি [illegible] চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ! কি সুন্দর মধ্যদেশ! কি বিশাল নিতম্ব! কি সুন্দর চরণযুগল! কি সমুচ্চ উন্নত বক্ষঃস্থল! কি অনাবদ্ধ আলুলায়িত সুকৃষ্ণ চিক্কণ

জানুপ্রলম্বিত কেশরাশি! এ বয়সে কত মুখ দেখিয়াছি, সেরূপ মুখত আর কখনও দেখি নাই। সে মুখ সর্ব্বতোভাবে অনিন্দনীয়। সে মুখ গোল নয় লম্ব নয়, অথচ লম্বা গোল উভয় ভাবে বিধাতার এক নূতন সৃষ্টিকৌশল প্রকাশ করিতেছে। সেরূপ প্রশস্ত সমতল ললাট দেখি নাই। সেরূপ আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্র কখনও দেখি নাই, গ্রন্থে পড়িয়াছি। সেরূপ চক্ষু, সেরূপ নাসিকা, সেরূপ ওষ্ঠ, সেরূপ দন্ত এ পর্য্যন্ত কবির কল্পনায় চিত্রিত দেখিয়া রূপান্ধ কবিকে উপহাস করিয়াছি। এতদিন যাহা কবি কল্পনায় দেখিয়াছি, অদ্য তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম।

নবীন এইরূপ চিন্তায় রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে মধুর অগ্রে লাহিড়ী বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন মধু একটু বেলায় আসিলেন। দুইজনে রাধিকা বাবু ও গুরুদাস বাবুর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ভাদুড়ি মহাশয় ও অম্বিকা বাবুকে তথায় ডাকিয়া আনা হইল। মধুর পক্ষ হইতে রাধিকা ও অম্বিকা বাবু কন্যা দেখিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবেন, এবং নবীনের পক্ষ হইতে আর দুইজন নির্ম্মলাকে দেখিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবেন স্থির হইল। সেই দিনই দুইটার সময় কন্যা দেখা ও আশীর্ব্বাদ করা হইল এবং সেই দিনই রাত্রি আটটার সময় গুরুদাস বাবুর বাড়ীতে লগ্নপত্র করা হইল। ১৮ই বৈশাখ প্রথম লগ্নে রাত্রি নয়টার সময়ে নবীনের সহিত নির্ম্মলার ও দ্বিতীয় লগ্নে রাত্রি এগারটার সময় মধুর সহিত বিধুমুখীর বিবাহ হইবে স্থির হইল।

লগ্নপত্রের দুই এক দিন পরে লাহিড়ী-বাড়ীতে সংবাদ আসিল, নবীন লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত পাল্লা দিয়া বিবাহে খরচ করিবেন। মধুর বিবাহের খরচ গুরুদাস বাবু ও নির্ম্মলার বিবাহের ব্যয় ভাদুড়ি

মহাশয় দিবেন, স্থির হইয়াছিল। এই সংবাদে বাস্তবিক বিবাহের ব্যয়ের কিছু বাড়াবাড়ী হইয়াছিল। প্রকৃত কথা এই,—নবীনের ভ্রাতৃবধূ নবীনকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরপো! তোমার ও বিধুর বে আমার জীবনের শেষ বে। আমার পুত্রও নাই, আর বেও দিব না। তুমিও কৃপণের অগ্রগণ্য, এ বেতে যদি টানাটানি কর, একে আন্‌তে ওকে না আন, এ দ্রব্য আন্‌তে ও দ্রব্য ফুরায়, তা'হলে আমি বড় কষ্ট পাব। বাজী, বাজনা ও আলো খুব ভাল করিতে হবে।" এই কথাই রূপান্তরিত হইয়া লাহিড়ী বাড়ীতে পৌঁছিয়াছিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্বাহ।

বিবাহ কি মধুর শব্দ! রোরুদ্যমান শিশুকে রক্তবর্ণা বধূর সহিত বিবাহের কথা বলিলে, সে রোদন ছাড়িয়া হাসিয়া উঠে। বালকবালিকাকে বিবাহের কথা বলিলে তাহাদের সুন্দর মুখে মৃদু মধুর হাসির উদয় হইয়া মুখকে প্রফুল্ল করিয়া তুলে। যুবক যুবতীর নিকট বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তাহারা স্থিরচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া সে প্রস্তাবে মনোযোগী হয়। দয়িতাহীন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধকে বিবাহের জন্য অনেক সময়ে বাতুল প্রায় হইতে দেখা যায়। বিবাহ সকলের মনকে এত আকর্ষণ করে কেন? বিবাহের মনোহারিণী চিন্তায় সকলেই এত সুখী হয় কেন? নিজের হৃদয়-সিংহাসনে অপরের মনোমোহিনী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নর বা নারী এত পূজা করে কেন? বুঝিয়াছি, মানব অতি দুর্ব্বল। বুঝিয়াছি, মানব আশ্রয় বা সঙ্গিনীর জন্য বড় ব্যাকুল। বুঝিয়াছি,

সংসার-প্রান্তরে ক্লেশ-বিভাকরের প্রখরকিরণে লোকে মস্তক রাখিবার জন্য অপরের সুশীতল অঙ্ক প্রার্থনা করে।

এই কারণেই মানবগণ এত আসঙ্গলিপ্সু। শৈশবে মাতা, বাল্যে ক্রীড়াবন্ধু, যৌবনে পত্নী, বার্দ্ধক্যে সন্তান, যেন মানবগণ প্রাকৃতিক অলঙ্ঘ্য নিয়ম-বলেই চাহিতেছে। অসভ্য সমাজে বিবাহ প্রথা নাই। প্রাকৃতিক নিয়মে অসভ্য মানব বিবাহের প্রয়াসী হইলে, সে পাত্রী ভেদাভেদ অধিক না করিয়া, রমণীসঙ্গ লাভ করে। সুসভ্য সমাজেই বিবাহের প্রথা। এ প্রথা সুসভ্য সমাজে এত আধিপত্য লাভ করিয়াছে যে, ইহা সমাজের সর্ব্বাগ্রগণ্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্য দেখাইবার, কুল ও বংশমর্য্যাদার পরিচয় দিবার, রূপ প্রকাশ করিবার, গুণ প্রচার করিবার, এ একটী প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যে কার্য্য সংসারে নরস্রোত প্রবহমাণ রাখিতেছে, স্রষ্টার উদ্দেশ্য পালন করিতেছে, সে যে পবিত্র কার্য্য তাহার সন্দেহ নাই। তাহাতে শুভাশুভ সময়, বংশ, কুল, শিক্ষা রূপ, গুণ দেখাই উচিত। পবিত্রতা ও মাঙ্গলিক ক্রিয়া শুভকার্য্যের অঙ্গ। পবিত্রতা এখন দেখা হউক বা না হউক, মাঙ্গলিক ক্রিয়ানুষ্ঠান এক্ষণেও আছে। বাজী, বাদ্য, আলোক, নৃত্যগীত, হাস্যপরিহাস, আমোদ আহ্লাদ এইগুলি মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অঙ্গ। এই কারণেই বিবাহ বাড়ীর রমণীগণ আমোদ উল্লাসে নিমগ্না, এই কারণেই বিবাহ বাড়ীর পুরুষগণ হাস্যকৌতুকে মত্ত। বিবাহের প্রধান অঙ্গ চারিটী, (১ম) বর ও কন্যার বসন, ভূষণ, দানসামগ্রী (২য়) বাজীবাদ্য, আলোক, নৃত্যগীত। (৩য়) পুরুষ ও রমণীকুলের উৎসব। (৪) আহার, দান ও কাঙ্গালীবিদায়।

পাঠক! তুমি এ বিবাহে কোন্‌টী দেখিতে চাও? বসন, ভূষণ,

দানসামগ্রী, বরের প্রাপ্য দেখিলে তোমার নেত্রের তৃপ্তি হইবে বটে, মধু ও নির্ম্মলার প্রতি সহানুভূতি থাকিলে সন্তুষ্টও হইবে; সুতরাং সে সম্বন্ধেও আমার দুই এক কথা বলিতে হয়। বিবাহের দ্বিতীয় বিষয় নৃত্য, বাদ্য, গান, ইত্যাদি। দীন বালক বালিকার বিবাহ সুসময়ের শুভকার্য্যের উৎসবের কথা কিছু না বলিলে, আমাকে নিতান্ত মূঢ় বলিবে। রমণীকুলের আমোদ আহ্লাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আধুনিক সুসভ্য সমাজের অনুমোদিত নহে। তবে কিনা, মধু কলিকাতায় বন্ধুবান্ধববিহীন হীন অবস্থার লোক, সেই কারণে সে বিষয়ে কিছু না বলিলে তুমি ভাবিবে, বিবাহটা অঙ্গহীন হইল। বিবাহের মিষ্টান্ন অপর লোকের প্রাপ্য; এ বিষয়ে কিছু না বলিলে, আমি ব্রাহ্মণ, আমারই মনের শান্তি হয় না। অতএব বিবাহের চতুরঙ্গ সম্বন্ধেই দুই চারিটি কথা বলিতে হইতেছে।

পূর্ব্বের কথিত চারিটী বিষয় ভিন্ন নির্ম্মলা ও মধুর বিবাহ-সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে। ভাদুড়ী মহাশয়ের সস্ত্রীক শরাগত ছিল না এবং পুত্রেরাও কেহ বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই; সুতরাং তিনি নির্ম্মলার বিবাহের জন্য যে টাকা দিলেন, তাহাতে কোন কথা হইল না। লাহিড়ী-বাড়ীতে ইদানীং কেহ কেহ মধুর হিংসা করিতেন, তাঁহারা মধুর বিবাহের ব্যয়াধিক্য দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গুরুদাস বাবু তাহা বুঝিতে পারিয়া, সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "লোকে কত খেলা করিয়া, বারয়ারি পূজা করিয়া, কুকুর-বিড়ালের বিবাহ দিয়া, সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিতেছে। আমি যা কিছু অর্থ-সঙ্গতি করিয়াছি, তোমাদের মধ্যে আজও এমন কেহ হও নাই যে, কিছু অর্থ আমাকে সঞ্চয় করিয়া দিতে পার। এই মধু আট বৎসর তোমাদের

বাড়ীতে বিনা বেতনে খাটিতেছে। তোমরা বলিতে পার, হৌসে সে প্রথমতঃ তিন চারি বৎসর বেতন পাইত। সে বেতনে মধু তোমাদের বাড়ীর কাজ করিতে বাধ্য ছিল না। মধু যেরূপ কাজ করিয়াছে, সেরূপ কাজের লোক কুড়ি টাকা বেতনেও পাওয়া যায় না। এই নয় বৎসরের বেতন দিলেও তাহাকে কত দিতে হইত? দ্বিতীয়তঃ—দেখ, আমি একটী কার্য্য করিতেছি, ইহাতে আমারই নাম হইয়াছে। ইহাতে যদি অপযশ হয়, তাহা হইলে আমারই হইবে। এরূপ স্থলে কৃপণতা করা বড় মূর্খের কার্য্য। যাহা করিতে হইবে, তাহাতে সকলের আন্তরিক যত্ন না থাকিলে কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। লোকে অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া কত অর্থ ব্যয় করে, মধু মানুষ, পথ হইতে আনিয়া তোমরাই মানুষ করিয়াছ। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, নিজের যত্নে সে লেখা পড়া শিখিয়া ভাল কার্য্য পাইয়াছে। এক্ষণে তাহার বিবাহটী হইলেই আমাদের ক্ষুদ্র পরোপকারব্রত উদ্যাপিত হয়।”

এই কথায় লাহিড়ী-বাড়ীর সকলেই মধুর বিবাহের জন্য আন্তরিক যত্ন করিতে লাগিল।

বিবাহের কিছু অগ্রে রাধিকা বাবু মধুর বাটীতে আসিয়া বাটীর উত্তরের ও পশ্চিমের পোতায় বড় বড় দুই খানি গোলপাতার ঘর বাঁধাইলেন। বড় দালানের উপরে গোলপাতার ছাপড়া করাইলেন। বাটীর সম্মুখে পুষ্করিণীর পশ্চিম ধারের ফুলগাছ গুলি সরাইয়া তথায় নৃত্যগীতাদির জন্য এক বৃহৎ গোলপাতার গৃহ প্রস্তুত করা হইল। ঐ পুষ্করিণীর পূর্ব্ব দিকেও আর একখানা গৃহ নির্ম্মিত হইল। বলা বাহুল্য, বাড়ী সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। নবীনের বাটীতে গৃহাদি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন ছিল না।

নির্ম্মলার ভূষণ ও বস্ত্র ভাদুড়া মহাশয় পূর্ব্বেই দিয়াছিলেন। এক্ষণে কৌশলে নবীন মধুকে কি কি দান সামগ্রী দিবেন, তাহার ফর্দ্দ আনাইয়া নির্ম্মলার বিবাহের দান সামগ্রী সেইরূপ সংগ্রহ করা হইল। বিধুমুখীর বিবাহের বসন ভূষণ ও দান সামগ্রী যে বিলক্ষণ মূল্যবান্ ও উৎকৃষ্ট দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

উভয় বাড়ীতে গড়ের গোরা বাদ্যকর বায়না করা হইল; বাজীও অনেক টাকার আসিবে স্থির হইল। বরের জন্য চারি ঘোড়ার গাড়ী ও অপর ত্রিশখানা করিয়া জুড়ীগাড়ী সাহেববাড়ী হইতে আসিবে স্থির হইল।

প্রত্যেক বাড়ীতে আলোর জন্য ৫০০ শত খাস গ্লাসের বায়না করা হইল। নৃত্য গীতের জন্য দুই বাড়ীতে কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ আটটী বাইজীর বায়না হইল।

অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, মধুর বাটীতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইল না। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করাতেই মধুর দেশ হইতে অনেক স্ত্রীলোক আসিলেন। ভাদুড়ী বাড়ীর রমণীকুল মধুর বাড়ীতে গমন করিলেন। লাহিড়ী-বাড়ী হইতেও অনেক স্ত্রীলোক মধুর বাড়ীতে আসিলেন। ভাদুড়ী ও লাহিড়ী বাবুদের আত্মীয়ের মধ্যে অনেক কামিনী, প্রতিপালিত মধুর বাড়ীতে গমন করা শ্লাঘার কার্য্য ভিন্ন অপমানের কার্য্য মনে করিলেন না। নবীনের বাড়ীতেও বামাকুলের ঘোর ঘটা হইল। উভয় বাটীর অন্তঃপুরে অনেক কামিনী ফুল ফুটিল। রূপের বাজার বসিল, আমোদ উল্লাসের একশেষ হইল।

পাঠক! বোধ হয় তুমি অবগত আছ, অভ্যর্থনা, যত্ন ও আদর অনেক রকম আছে। অভ্যর্থনা, আদর ও যত্ন যেরূপ পুরুষসমাজে বিবিধ,

সেইরূপ নারীসমাজেও তাহার বাহুল্য লক্ষিত হয়। কাহারও পুত্রের বিবাহে জ্যেষ্ঠা কন্যার শ্বশুর রায় বাহাদুর কমলাকান্ত বাবু যেরূপ সমাদর ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন, সেই বিবাহে জ্যেষ্ঠ পুত্রের শ্বশুর দীন দুখিরাম ঠাকুর সেরূপ আদর ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন না। স্ত্রী সমাজেও যাঁহার যেরূপ বসন ভূষণ, যাঁহার স্বামীর যে রূপ পদগৌরব তাঁহার সেইরূপ আদর অভ্যর্থনা হইয়া থাকে। পুরুষ-সমাজে চক্ষুলজ্জা ও নিন্দার ভয় আছে, নারীসমাজে চক্ষুলজ্জা ও নিন্দার ভয় অনেক সময়ে পরিদৃষ্ট হয় না।

পুরুষসমাজে আহারের সভায় কমলাকান্ত বাবু ও দুখিরাম ঠাকুরের একরূপ আহারের সামগ্রীর বন্দোবস্ত হইয়া থাকে, কিন্তু নারী সমাজে বহুবসনভূষণ-সজ্জিতা রায় বাহাদুর-সহধর্ম্মিণী কমলা ও দানা হীনা মলিনবসনা ভূষণবর্জ্জিতা অমলা একরূপ আহার সামগ্রীও প্রাপ্ত হন না। কমলার জলযোগের জন্য হয়ত মণ্ডা, মিঠাই, আপেল, আঙ্গুরের বন্দোবস্ত হইল, আর সেইস্থানে বসিয়া অমলা হয়ত একমুটা মুড়ি মুড়কিও পাইলেন না। ধনীর ঘরের গৃহিণীগণ ও নূতন ধনী রমণীকুলের মধ্যেই এই পার্থক্যের বাহুল্য লক্ষিত হয়। মহামায়া ও নবীনের ভ্রাতৃবধূ নূতন প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহাদের নিকট ধনা নির্ধন সকলের তুল্য আদর অভ্যর্থনা ছিল। তাঁহাদের বাটীতে সমাগতা বামাকুল তাঁহাদের ব্যবহারের প্রতিকূলে কিছুই বলিতে পান নাই।

অমলা, কমলা, সরলা, বিমলা, নিস্তারিণী, সরোজিনী, গজগামিনী, মল্লিকা, মালতী, গোলাপ, সুরবালা, গিরিবালা, মনোরমা তিলোত্তমা, ভগবতী, জাহ্নবী, সাবিত্রী ইন্দুমতী, চারুশীলা, চন্দ্রমণি, সূর্য্যমণি, প্রভৃতি ললনাকুল, কত আমোদই করিতে লাগিলেন।

একটু বয়োধিকা ইন্দুমুখী একখানি চেলা কাষ্ঠ হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া, গোটা কয়েক টোকা দিয়া কহিলেন,—

"এই ভীম হরধনু যে বীর ভাঙ্গিবে।
আমার সীতার পতি সেই জন হবে॥"

এই কথা বলিয়া তিনি চন্দ্রমুখীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মা আমার কতকাল আইবুড় থাকিবে?" এই কথায় চন্দ্রমুখী একটু দুঃখিতা হইলেন, কেন না, তাঁহার কুলীন স্বামী বহুদিন আসেন নাই। কাদম্বিনী প্রভাবতী শশীমুখী বীর সাজিয়া, আস্ফালন করিয়া ধনুক ভাঙ্গিতে গেলেন। হাসির বিষম রোল উঠিল।

অপর স্থানে নিতম্বিনী চুল ছাড়িয়া দিয়া, বড় একছড়া হার গলায় দিয়া, দাঁড়াইয়া কোন স্থানে যাইবেন বলিয়া, যেই এক পা বাড়াইয়াছেন, অমনি বসন্তকুমারী তাঁহার পায় ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন ;—

"আমি রাধা দাসী তব, তোমার লাগিয়া,
ননদ পতির ভয় কিছু না করিয়া,
তোমার তরেতে নাথ! আইনু কাননে ;
আমাকে ছাড়িয়া কেন যাও অকারণে।

নিতম্বিনী অমনি বলিয়া উঠিল ;—

আয়ানের ভয়ে মোর কাঁপিছে হৃদয়।
কানন-কুঞ্জেতে আর দেখা করা নয়॥

এই কথা হইতে না হইতে সুশীলা আয়ান হইয়া আসিল। অগ্রে অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিল। পরে রাধিকাকে কৃষ্ণকালীর ভজনা করিতে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে নিজেও প্রণিপাত করিয়া স্তব করিতে বসিল। বিষম হাসির রোল উঠিল।

অল্পবয়স্কা স্বর্ণকুমারীর চুল কপালের উপর চুড়া করিয়া বাঁধা ছিল। বিমলা সেই চুলে একটী গোলাপ ফুল পরাইয়া এক গাছি ফুল তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ! বাজাও: তোমার ভুবনমোহন বংশী একবার বাদন কর, গোপাঙ্গনাকুল আকুল হইয়া আসুক।"

স্বর্ণ, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তখন বর্ষীয়সী পক্বকেশী বরদা তাহার নিকটে রাধিকা হইয়া বসিল। চারিদিক হইতে গীত উঠিল,--

"রাধাশ্যাম একাসনে শোভিছে ভাল।
শোভিছে ভাল, আমাদের শোভিছে ভাল॥"

এই গীত খুব গোলজার হইয়া উঠিল, বিষম হাস্যের ধ্বনি হইতে লাগিল। এইরূপ কত আমোদ হইতে লাগিল।

পুরুষ-মহলেও আমোদ উল্লাস কম হইল না। তাস, পাশা ও দাবার চটচটী, ঠকঠকীতে বহির্বাটী শব্দিত হইতে লাগিল। ডুগি, তবলা, ঢোলক, পাখোয়াজের বাদ্যের সহিত ছোট বড় অঙ্গের অনেক সঙ্গীতই অনেকে গাহিলেন। অতঃপর কুঞ্জবিহারী খঞ্জনী বাজাইয়া যশোহরের জারি গাহিয়া অন্তঃপুরের রমণীকুলকে পর্যান্ত বহির্বাটীতে আকর্ষণ করিলেন। বিনোদলালের বরিশালের রামায়ণে নারী-পুরুষ সমভাবে পুলকিত হইয়া অট্টহাসি হাসিলেন। সর্ব্বোপরি কেশব ও কানাই বাবুর বাঁকুড়ার তর্জ্জার লড়াইয়ে আমোদের একশেষ হইল।

লুচী, তরকারী, ডাইল ডাল্না, সন্দেশ, রসগোল্লা ও নানাপ্রকার মিঠাই উভয় বাড়ীতে যথেষ্ট পরিমাণে হইল। বিবাহের দিন আসিল। প্রথম লগ্নে ঘোর আড়ম্বরে নবীনে নির্ম্মলায় ও দ্বিতীয় লগ্নে মধুতে বিধুমুখীতে শুভপরিণয় হইল। সমাগত ব্যক্তিগণকে সাদরে উত্তমরূপে জলপান দেওয়া হইল, বিবাহান্তে রজনীতে নৃত্য গীত হইল। আমরা

জলপানের মুখে, নৃত্য গীত দর্শন শ্রবণান্তে বিদায় হইব না; কাঙ্গালী বিদায়টা দেখিয়া যাইব।

উভয় বাটীতে পরদিন কতকগুলি কাঙ্গালীকে ভোজন ও বিদায় দেওয়া হইল। কাঙ্গালীগণের ভোজন ও বিদায় দান সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইল। মধুর বাড়ীর কাঙ্গালীগণের মধ্যে একটী অন্ধ কাঙ্গালিনী অপর একটী কাঙ্গালিনীর আঁচল ধরিয়া আসিয়াছিল। প্রথমাকে দ্বিতীয়া আনিতে বড রাজী ছিল না ও অনেক গালিবর্ষণ করিয়াছিল। অনেকে অন্ধ কাঙ্গালীকে 'চিনি চিনি' করিয়া পরে চিনিলেন। এ সেই ভাদুড়ী-বাড়ীর নূতন ঝী; তাঁহারা তাহাকে কিছু না বলিয়া, বিদায় ও আহার ভাল করিয়া দিলেন। যাহারা তাহাকে চিনিলেন, তাঁহারা পরস্পর বলা কহা করিলেন, "অনেক সময়ে পাপের ফল হাতে হাতে হয়।" এই ঝী দেড়মাস মধ্যে অন্ধ ও হতশ্রী হইয়াছে।

উপসংহার।

যৎকালে গ্রন্থকার মহকুমা বনগ্রামের বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে নির্ম্মলার স্বামীর বাসায় যাইতেন। আষাঢ় মাসের একদিন অপরাহ্ণে তিনি নির্ম্মলার বাসায় গিয়া দেখেন, তাঁহার একটী পুত্র বাহির বাটীতে কান্দিতেছে। তিনি শিশুকে কোলে করিলে শিশু নিস্তব্ধ হইল। আকাশে মেঘ টল টল করিতেছিল, বৃষ্টি হইবার আর বেশী বিলম্ব ছিল না। বাসায় কোন দাসদাসী ছিল না। শিশু একটী ভৃত্যের অনুগমন করিয়া বাহির বাটীতে আসিয়াছিল; কিন্তু চাকর তাহা জানিতে না পারিয়া বাজারে চলিয়া গিয়াছিল। গ্রন্থকার কিছু সঙ্কটে পড়িলেন, এই সময়ে জানালা দিয়া নির্ম্মলা গ্রন্থকারকে ডাকিয়া শিশুকে বাটীর মধ্যে দিতে বলিলেন। গ্রন্থকারও বাটীর মধ্যে গেলেন; বৃষ্টিও মুষলধারে নামিয়া পড়িল। তৎকালের বালক—এই গ্রন্থের প্রণেতা—বাধ্য হইয়া বাটীর মধ্যে একটী মোড়ার উপর বসিয়া

থাকিলেন। এই অবসরে নির্ম্মলা গ্রন্থকারের পরিচয় লইলেন। গ্রন্থকারের হীনাবস্থা শুনিয়া তিনি এই উপন্যাসের উপাখ্যানটী বলিদেন। তিনি নির্ম্মলা মধু নাম দিয়াই এই উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের আগ্রহাতিশয়ে তিনি নিজে নির্ম্মলা ও তাঁহার ভ্রাতা মধু এ কথা বলিয়াছিলেন।

এই উপাখ্যানের হলধর মুখোপাধ্যায়. তদীয় পত্নী, অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র দাস বৈরাগী, ঠাকুর দাস বণিক, উমেশচন্দ্র দত্ত, গুরুদাস লাহিড়ী, ভোলানাথ লাহিড়ী, রাধিকাচরণ লাহিড়ী. ভাদুড়ী মহাশয়, জগৎচন্দ্র বসু. শ্যামাচরণ ঘোষ ও কৃষ্ণবিহারী বসুর প্রকৃত নামই দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের নামের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মহামায়া ও শশীমুখীর নামেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

রামধন. মধু, মাধব. কেশব. নির্ম্মলা, নবীনচন্দ্র ও বিধুমুখীর নাম ও শ্যামচাঁদের জাতি পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। অধ্যক্ষ জার্ডিন ও থোয়েটের নাম প্রকৃত কিন্তু জলখাবার বিক্রয়ের স্থানটী ঠিক দেওয়া হয় নাই।

মধুর টালার বাড়ী ও নবীনের আমহার্ষ্ট ষ্টীটের বাড়ী ঠিক দেওয়া হইয়াছে।

যে কারণে শেষোক্ত নামগুলির পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা পাঠক নিম্নের এই পত্রখানি পড়িলে বুঝিতে পারিবেন :—

৺শ্রীশ্রীহরি।—

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

আপনার পত্র যথা সময়ে পাইয়াছি। পত্র পাইয়াই আপনাকে চিনিয়াছি। আপনি অন্ধ হইয়াছেন জানিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।

ভগবানের লীলা! তিনি যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতে তুষ্ট থাকিতে হয়। আমার ভ্রাতা ও স্বামীর মত লইয়া এ পত্রের উত্তর দিতে হইল, একারণে যথাসময়ে উত্তর দিতে পারি নাই। অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

তাঁহারা বলিয়াছেন, আপনি যদি ইচ্ছা করেন, উপন্যাস প্রকাশ করিতে পারেন। আমাদের নাম ও জাতি ঠিক ঠিক দিবেন না। আমাদের উপকারী সুহৃদগণের নাম ঠিক ঠিক দিবেন, তাহার পরিবর্ত্তন করিবেন না। আমাদের বাড়ীর নম্বরও ঠিক দিবেন না। আমাদের উপকারীদিগের নাম জানিয়া যদি কেহ আমাদিগকে চিনিতে পারেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।

আমরা ছোট ছিলাম, এখন ভগবানের কৃপায় খাওয়া পরা চলে, পূর্ব্বকথা প্রকাশ হইলে লজ্জা পাইব, এজন্য আমাদের নাম জাতি পরিবর্ত্তন করিতেছি না। গ্রন্থের নায়ক নায়িকা হইয়া আপনার পাঠকগণের প্রশ্নের উত্তর দিতে লজ্জিত ও বিরক্ত হইব, এই ভয়ে নাম ও জাতি গোপন করিতে বলিতেছি।

অপর যে যে বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিতেছি;—

(ক) আমার মাতা ও আমার জা অর্থাৎ আমার ভ্রাতার শাশুড়ী কাশীধামে দুই বৎসর বাস করিয়া কাশীলাভ করিয়াছেন। আমার স্বামী ও আমার ভ্রাতা এক্ষণে ৬০০৲ টাকা বেতনের ডিপুটী। আমার তিন পুত্র, দুই কন্যা ও আমার ভ্রাতার দুই পুত্র ও দুই কন্যা; আমার মধ্যম পুত্র মেদিনীপুরের জজকোর্টের উকীল ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে। আপনি শুনিয়াছেন যে, আমার ভ্রাতা ও তাঁহার ভায়রাভাইয়ের মধ্যে যে শ্বশুরের সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হইয়াছিল তাহা সত্য!

কলিকাতায় অনেক ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায় দুই পাইয়াছেন। কেবল পৈতৃক বাটীর ভাগ কোন কন্যা স্বামীরই আছে।

(খ শশীমুখী আমার মাতা ও জায়ের সহিত ছিলেন। তথায় তাহার তিন মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। বিধবার ন্যায় আমাদিগের সংসারে কালাতিপাত করিয়

টালার সেই বাড়ী আমার ভ্রাতাদিগের প্রধান বা পুষ্করিণী ভরাট করিয়া বড় বাড়ী করিয়াছেন। নিবেদ

সে